কাজী আবদুল ওদুদের কথাসাহিত্যে বিধৃত সমাজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ফিল ডিগ্রির জন্য পেশকৃত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর, ২০০৬

404167

Dhaka University Library
404167

তত্ত্বাবধায়ক

ড.মনোয়ারা হোসেন

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

মাহবুবা জিন্নত

এম, ফিল গবেষক,

রেজিস্ট্রেশন নং- ২৭/২০০০-২০০১

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

404167

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মাহবুবা জিন্নত কর্তৃক উপস্থাপিত "কাজী আবদুল ওদুদের কথাসাহিত্যে বিধৃত সমাজ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

২৭ ১২. ২০০৬

(ড.মনোয়ারা হোসেন)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

"কাজী আবদুল ওদুদের কথাসাহিত্যে বিধৃত সমাজ" আমার এম, ফিল অভিসন্দর্ভের শিরোনাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনোয়ারা হোসেন এর তত্ত্বাবধানে ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে আমি এম, ফিল কোর্সে নিবন্ধন লাভ করি এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড.রফিকুল্লাহ্ খান ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহ্জাহান মিয়ার কাছে এম, ফিল প্রথম পর্বের কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করি।

404167

অভিসন্দর্ভ রচনার প্রতিটি স্তরে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড.মনোয়ারা হোসেন এর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং উপদেশ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্যবিন্যাস, রূপরেখা নির্মাণে তাঁর দিক নির্দেশনা আমার গবেষণা কর্মকে করেছে সহজসাধ্য। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে পরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত দিয়েছেন অধ্যাপক ড.ফাতেমা কাওসার ও অধ্যাপক ড.রফিকুল ইসলাম। তাঁদের সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি এবং তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলা বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে।

গবেষণার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী,বাংলা বিভাগের সেমিনার ও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এ সূত্রে লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ঃ

কাজী আবদুল ওদুদের জীবন-কথা ৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

সমকালীন সাহিত্যিক ও সাহিত্যে বিধৃত সমাজ ১৫

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

কাজী আবদুল ওদুদের কথাসাহিত্যে বিধৃত সমাজ ২৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ গল্প ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ উপন্যাস ৬৪

উপসংহার ৯৭

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি ১০২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) প্রধানত মননশীল প্রাবন্ধিক ও বিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম মননশীল চিন্তাবিদ্ বলে পরিচিত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ একটি গল্প-সংকলন নাম 'মীর-পরিবার' (১৯১৮) এবং তার কিছু পরে প্রকাশিত হয় 'নদীবক্ষে' (১৯১৯) উপন্যাসটি। এই দুটো গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি বাংলার প্রধান সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অপর উপন্যাস 'আজাদ' (১৯৪৮) এবং তার কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ পায় গল্প ও নাটিকা সংকলন 'তরুণ' (১৩৫৫)।

কাজী আবদুল ওদুদের কথাসাহিত্যে বিধৃত সমাজ নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ খুব একটা নেই। তাই আমার উদ্দেশ্য তাঁর কথাসাহিত্যে বিধৃত সমাজ পূর্ণাঙ্গরূপে তুলে ধরে তার মূল্য বিচার করা। সে জন্যই আমি কাজী আবদুল ওদুদের কথাসাহিত্যে বিধৃত সমাজকে তুলে ধরার প্রয়াস অনুভব করি। মোট তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত রূপে পরিকল্পিত হয়েছে এ অভিসন্দর্ভের অবয়ব। এছাড়া রয়েছে "ভূমিকা" ও "উপসংহার" অংশ। প্রথম অধ্যায়ে কাজী আবদুল ওদুদের জীবন-কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমকালীন সাহিত্যিক ও সাহিত্যে বিধৃত সমাজ, তৃতীয় অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। (ক) প্রথম পরিচ্ছেদে, কাজী আবদুল ওদুদের গল্পে বিধৃত সমাজ এবং (খ) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, কাজী আবদুল ওদুদের উপন্যাসে বিধৃত সমাজ।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কাজী আবদুল ওদুদ-রচনাবলী তৃতীয় খন্ড অনুসৃত হয়েছে এছাড়া যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি সেসব গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে। উদ্ধৃতি ব্যবহারের সময় লেখকের মূল বানানরীতি বজায় রেখেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

কাজী আবদুল ওদুদের জীবন-কথা

Dhaka University Institutional Repository

কাজী আবদুল ওদুদ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল (১৩০১ বঙ্গাব্দে ১৪ বৈশাখ, শুক্রবার) ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত বাগমারা গ্রামে জন্মগ্রণ করেন। তাঁর পিতামহের নাম কাজী ইয়াসিন আলী ও পিতার নাম কাজী সৈয়দ হোসেন ওরফে ছগীর কাজী।[১]

কাজী আবদুল ওদুদের মাতামহ পাঁচু মোল্লা বাগমারা গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরের হোগলা গ্রামের 'বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ও প্রতাপশালী জোতদার' ছিলেন।[২] বাগমারার কাজীরা 'শরিফ' বলে পরিচিত ছিলেন ; এই শরাফতির বদৌলতেই দরিদ্র ছগীর কাজী চাকুরী লাভের আগেই বিত্তবান পাঁচু মোল্লার কনিষ্ঠ কন্যাকে বিয়ে করেন।[৩] ছগীর কাজী দর্শনা, সোদপুর, হাওড়া প্রভৃতি রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন-মাস্টার ছিলেন। ওদুদের পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "সগীর সাহেব রেলওয়ের চাকুরে ব'লে তাঁকে অধিকাংশ সময় স্টেশন কোয়ার্টারেই থাকতে হতো। কদাচিৎ বাগমারার বাড়ীতে আসতেন। তিনি বড় মিশুক ও রসিক লোক ছিলেন। গ্রামে এলেই সবার বাড়িতে এসে দেখা করতেন। আর অনেক গল্পগুজব করতেন। ওঁর কথা-বার্তার ঢং ছিল অতিশয় স্পষ্ট আর মতামত অতিশয় দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট। গ্রামের সবাই তাঁকে ভালোবাসতো, তিনিও কারো শত্রু ছিলেন না। ১৯২০-২১ সালের কিছু পরে তাঁর মৃত্যু হয়,– হাওড়াতে স্টেশন কোয়ার্টারেই।"[৪] শেষ বয়সে তিনি হাওড়ার স্টেশন-মাস্টার হন এবং হাওড়াতেই দেহত্যাগ করেন। তিনি তাঁর চাকুরী-জীবনের সূচনায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে যখন হাসপাতালে, তখন কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম হয়। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর অসম্পূর্ণ 'স্মৃতিকথায়' বলেছেন ঃ "আমি না-কি দেখতে খুব কুৎসিত হয়েছিলাম। মাথায় ছিল কতকগুলো কাটার দাগ। মা বলেছেন ঃ ছেলের দিকে তাকিয়ে মোটেই খুশী হই নি।"[৫]

বাল্যে আবদুল ওদুদের ডাক নাম ছিল ফতেহ্ কাজী। তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর মামার-বাড়ীতে। তিনি জগন্নাথপুর মাইনর স্কুলে দুই বছর প'ড়েছিলেন। তাঁর ছোট মামা নাজিরউদ্দীন দারোগা হয়ে ঢাকায় চাকুরী পেলে কাজী আবদুল ওদুদকে পড়াশোনার ভাল ব্যবস্থার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসেন।[৬] এই মাতুলের চাকুরীর বদলী জনিত কারণে ওদুদকে জগন্নাথপুর, ঢাকা, নরসিংদী, পাবনা, মুড়াপাড়া (নারায়নগঞ্জ) প্রভৃতি স্থানে স্কুল-জীবন কাটাতে হয়েছিল। এর ফলে কৈশোরেই তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

কাজী আবদুল ওদুদ ভালো ছাত্র ছিলেন। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হয়ে পাশ করতেন। ১৯১২ সালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় একটি দশ টাকার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তিনি তাঁর মামা নাজিরউদ্দীন সাহেবের পরামর্শক্রমে কলকাতা এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হন।[৮] এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ও সুরের অভিনবত্ব কাজী আবদুল ওদুদের মন আকর্ষণ করে ; তিনি একটি 'গীতাঞ্জলি' কিনে এনে গান অভ্যাস করেন এবং 'সবুজ পত্রের' গ্রাহক হন। 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' লেখাটি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে।[৯] তিনি তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সমর্থন পেয়েছিলেন।[১০] তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময় সরকারী বেকার হোস্টেলে থাকতেন। সেই হোস্টেলেরই অন্য এক কক্ষে থাকতেন শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক । তাঁরা তখন হোস্টেলে একটি হাতে লেখা ম্যাগাজিন বের করেন। তাতে কাজী আবদুল ওদুদ 'শ্রী দীক্ষিত' ছদ্মনামে একটি লেখা দেন। এভাবেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম সূত্রপাত।[১১]

১৯১৭ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে বি.এ. পাশ করেন। তখন পর্যন্ত সংস্কৃত তাঁর একটি বিষয় ছিল। উর্দু তিনি স্কুল কলেজের বাইরে শিখেছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইকনমিক্সে (পলিটিক্যাল ইকোনমিতে) এম.এ.পাশ করেন। বি.এ. পাশ করার পর কাজী আবদুল ওদুদকে বেকার হোস্টেল ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এম.এ. পড়ার সময়ে এবং তার পরেও কিছুদিন তিনি তাঁর মামা বেঙ্গল পুলিশের ইনস্পেক্টর নাজিরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। তিনি যখন কৃষ্ণনগরে বদলী হয়ে গেলেন, তখন ওদুদ সাহেব কিছুদিন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য–সমিতির অফিসে তাঁর বন্ধু 'মোসলেম ভারত' এর আফজাল-উল হক সাহেবের সঙ্গে থাকেন।[১২] এখানেই কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।[১৩]

কাজী আবদুল ওদুদের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে।[১৪] শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। দীর্ঘদিন তিনি এ-কলেজে শিক্ষকতা করার পর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সরকারের টেক্সট বুক কমিটির সেক্রেটারী হন। এই কর্ম উপলক্ষে তিনি ঢাকা, কলকাতা, রাজশাহী ঘুরে শেষে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতায় অবসর গ্রহণ করেন।[১৫]

কথাসাহিত্যিক রূপে বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ।[১৬] তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ একটি গল্প-সংকলন, নাম 'মীর-পরিবার' (১৯১৮)। তার পরে 'নদীবক্ষে' (১৯১৯) উপন্যাস। মাঝখানে পাঁচটি প্রবন্ধ- গ্রন্থের পর বের হয় 'পথ ও বিপথ' (১৩৪৬) শীর্ষক নাটক। এরপর প্রকাশিত হয় একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ ও দুই খন্ডে 'কবিগুরু গ্যেটে' এবং উপন্যাস 'আজাদ' (১৯৪৮) ; কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ পায় গল্প ও নাটিকা সংকলন 'তরুণ' (১৩৫৫)। কাজী আবদুল ওদুদের সৃষ্টিশীল ধারার (গল্প-উপন্যাস-নাটক) রচনার এখানেই সমাপ্তি।[১৭] এরপর থেকে তিনি নিবিষ্টচিত্তে প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন।[১৮] তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্প লিখেছেন, সাহিত্য সমালোচনা লিখেছেন, হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে মানবিক বিপর্যস্ততা দূর করার চেষ্টা করেছেন। আবার পাশ্চাত্যের মনীষীদের একটি উল্লেখযোগ্য পরিচিতি বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়কে একজন আদর্শ পুরুষ বলে মনে করতেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের উপর কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য নিবন্ধন লিখে গেছেন। সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক অঙ্গনে তাঁর খ্যাতি 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মূল আদর্শ ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি।'[১৯] এর কর্মযোগী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৯৭-১৯৩৮) ও ভাবযোগী ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। সমাজের মুখপাত্র ছিল বার্ষিক 'শিখা'।[২০]

তাঁর প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'নবপর্যায়' (১ম খন্ড) প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে।[২১] ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে এর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়। নবপর্যায়ের অনেকগুলি প্রবন্ধে শিক্ষিত মুসলমানদের সমস্যা সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ আলোচনা করেন। এ আলোচনার ফলে তিনি অনেকের বিরাগভাজন হন। 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩৪ সনে। এই গ্রন্থে কবির

Dhaka University Institutional Repository

মনোবিকাশের ধারার অনুসরণ করে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ আলোচিত হয়েছে। তাঁর 'সমাজ ও সাহিত্য' নামক প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সনে। 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' গ্রন্থটি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সনে।তিনি বিশ্বভারতীতে 'নিজাম বক্তৃতা হিসাবে' হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিয়ে যে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন এ গ্রন্থটি তারই সংকলন। 'পথ ও বিপথ' নামক একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৪৬ সনে 'আজকার কথা' নামক প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৪৮ সনে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কবিগুরু গ্যেটে' দু'খন্ডে প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৫৩ সনে। এ গ্রন্থটি গ্যেটের চরিত কথা এবং সাহিত্যের পরিচয়। শুধু বাংলা ভাষায় নয়, সম্ভবত ভারতীয় সাহিত্যেও এ ধরনের আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নেই। তাঁর 'নজরুল প্রতিভা' প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯৪৯ সালে এবং ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় 'স্বাধীনতা দিনের উপহার' নামক প্রবন্ধ পুস্তক। তাঁর পূর্ব প্রকাশিত এবং পনেরটি নতুন প্রবন্ধের সংকলন নিয়ে 'শাশ্বত বঙ্গ' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৫৮ সনে। 'বাংলার জাগরণ' বলে তাঁর একটি প্রবন্ধ পুস্তক আছে যা প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৬৩ সনে। 'শরৎচন্দ্র ও তারপর' প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯৬১ সালে আর 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থটি দু'খন্ডে প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৬৯ ও ১৩৭৬ সনে। কাজী আবদুল ওদুদের সর্বশেষ দুটি গ্রন্থ হচ্ছে 'হযরত মুহাম্মদ ও ইসলাম' (১৩৭৩) এবং 'পবিত্র কোরআন' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, প্রকাশ কাল ১৩৭৩ এবং ১৩৭৪। [২২]

যে-সময়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, সে-সময়ে পৃথিবীর অনেক স্থানে মুসলিম সমাজে অগ্রগতির চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক ও আফগানিস্তানে আমানুল্লাহ সনাতন সমাজব্যবস্থার গোড়া ধরে টান দিয়েছিলেন। এসব ঘটনার প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের কৌতূহল ছিল অপরিসীম। সাধারণভাবে ভারতীয় ও বিশেষভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজেও নবযুগের লক্ষণ কিয়ৎ- পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে মুসলমানরাও তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। ঐ সময়ে প্রায় শ'দুয়েক বাঙালি মুসলমান গ্রাজুয়েটের সংবাদ পাওয়া যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২), কাজী নজরুল ইসলাম, (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভূত হয়ে সমাজের অচলায়তনকে নাড়া দিচ্ছিলেন। বিশ শতকে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা (১৯০৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১৯২০) ও খিলাফলত আন্দোলনের প্রসার (১৯১৯-২২) মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এক-একটি সম্মুখবর্তী পদক্ষেপ। [২৩]

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র-জীবনেই কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর বড় মামা আসহাবউদ্দীনের জ্যেষ্ঠা কন্যা জমিলা খাতুনকে বিয়ে করেন (২২ ফাল্গুন, ১৩২২ সন)।[২৪]

জীবনের গোধূলি বেলায়, বন্ধুদের অনুরোধে, তিনি আত্মচরিত রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি।[২৫] তিনি দুরারোগ্য 'পারকিনসন্‌স' রোগে[২৬] ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তাঁর কলকাতাস্থ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২৭] তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতা গোবরা গোরস্থানে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।[২৮] মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি 'শিশিরকুমার পুরস্কার' লাভ করেছিলেন। ভারতে তাঁকে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার বা রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হয় নি।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। আযদুল কাদির, কাজী আবদুল ওদুদ, ১৯৭৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১।

২। সাঈদ-উর রহমান, ওদুদ-চর্চা, ১৯৮২, একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮২, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৮৬।

৩। আবদুল কাদির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২।

৪। খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঃ সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যকম, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী ঃ বর্ধমান হাউস, ঢাকা, পৃষ্ঠা-(৩০৬-৩০৭)।

৫। আবদুল কাদির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২।

৬। আবদুল কাদির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২।

৭। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৭।

৮। আবদুর কাদির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩।

৯। আবদুল কাদির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-(৩-৪)।

১০। মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), অষ্টম সংস্করণ, ২০০৫, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬০।

১১। আবদুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪।

১২। আবদুল কাদের পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-(৪-৫)।

১৩। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৮।

১৪। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৮।

১৫। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৮।

১৬। সাঈদ-উর রহমান, ওদুদ-চর্চা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৭।

১৭। নুরুল আমিন, কাজী আবদুল ওদুদ-রচনাবলী (৩য় খন্ড),১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩।

১৮। সাইদ-উর রহমান, ওদুদ-চর্চা, , পৃষ্ঠা- ১৮৭।

১৯। মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), অষ্টম সংস্করণ, ২০০৫, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬০।

২০। সাঈদ-উর রহমান, ওদুদ-চর্চা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৮।

২১। সাঈদ-উর রহমান, ওদুদ-চর্চা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

২২। মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- (১৬০-১৬১)।

২৩। সাঈদ-উর রহমান, ওদুদ-চর্চা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৮।

২৪। আবদুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫।

২৫। সাঈদ-উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮।

২৬। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০৮।

২৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০৯।

২৮। আবদুল কাদির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭।

২৯। আবদুল কাদির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমকালীন সাহিত্যিক ও সাহিত্যে বিধৃত সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য-চর্চা করেন। এঁদের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম তিন দশক ধরে। আর বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে নজরুলের সচেতন পদচারণা শুরু হয় বিশ শতকের তৃতীয় দশকের গোড়া থেকেই। এঁদের অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম ছিল গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, কখনো কখনো নাটক। তবে এঁদের কেউই সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ধারায় যথেষ্ট অবদান রেখে যেতে পারেন নি। তাঁদের এই সীমাবদ্ধতার কারণ বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতার মধ্যেই নিহিত ছিল।[১]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান শিল্পী মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১)।[২] তিনি উনিশ শতকের সপ্তম দশকের দিকে বাংলা সাহিত্যের পরিণত যুগেই সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মচরিত 'আমার জীবনী' পাঠে জানা যায় তিনি ছাত্র-জীবন থেকেই সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন। বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি 'গ্রামবার্তা' সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙ্গাল হরিনাথ ছিলেন মশাররফ হোসেনের সাহিত্যগুরু। হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্তা' এবং ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা দুটিতে লিখেই মীর মশারফ হোসেন হাত পাকান।[৩] তাঁর সমাজ-সচেতনতা যে অত্যন্ত তীক্ষ্ম ছিল তাঁর 'জমিদার দর্পন', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' এবং 'বাজিমাৎ' প্রভৃতি গ্রন্থই তার সাক্ষ্য বহন করছে।[৪]

মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'রত্নাবতী' কে (শ্রাবণ, ১২৭৬), 'রূপকথা' জাতীয় উপাখ্যান বলে চিহ্নিত করা যায়। পাশ্চাত্য প্রভাব বর্জিত এই রচনায় মীর মশাররফ হোসেন নিজেকে সমাজ-সচেতন শিল্পী হিসেবে উপস্থিত করতে পারেন নি সত্য, কিন্তু ভাষা-শিল্পী হিসেবে পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন।[৫] কিন্তু 'রত্নাবতী' তে যার সূচনা 'বিষাদ-সিন্ধু'তে তারই মধ্যাহ্নদীপ্তি। মাঝখানে 'গোরাই-ব্রীজ অথবা গৌরী-সেতু' (১৮৭৩), 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩), 'জমিদার দর্পন' (১৮৭৩) ও 'এর উপায় কি?' (১৮৭৫)। 'বিষাদ-সিন্ধু'র সমকালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'সঙ্গীত লহরী' (১৮৮৭) 'গো জীবন' (১৮৮৯), 'বেহুলা গীতাভিনয়' (১৮৮৯) ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০)। 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশোত্তর-

Dhaka University Institutional Repository

কালের একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা 'গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯)। এর পরবর্তীকালের রচনায় অবক্ষয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট। জীবনের অন্তিমকালে রচিত 'আমার জীবনী' (১৯০৮-১০) ও 'বিবি কুলসুম' (১৯১০) মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিজীবনের রোমন্থন মাত্র।[৬]

'বিষাদ-সিন্ধু' নিঃসন্দেহে মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি এ-গ্রন্থে ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত কাহিনীকে জীবন-চেতনায় উন্নীত করেছেন। ফলে এ-গ্রন্থের কিছু সংখ্যক চরিত্র ইতিহাস ও পুথির বিবর্ণ পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে মানব-জীবনের জীবন্ত অনুভূতির সঙ্গে একীভূত হয়েছে।[৭]

'গাজী মিয়ার বস্তানী' মীর মশাররফ হোসেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপন্যাস জাতীয় রস রচনা, সুলিখিত উপন্যাস নয়। একটি মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিত্রগুলো বিকশিত হয় নি। অসংখ্য নর-নারী এখানে ভীড় করেছে। কাহিনী অংশের কতকগুলো ক্ষীণ সূত্র ধরে চরিত্রগুলো তাদের ক্রিয়াকলাপ ঘোষণা করেছে। মীর মশাররফ হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থির সংযমের অভাবই এ গ্রন্থখানির একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৮]

তাঁর 'এসলামের জয়' ইতিহাসও নয়, উপন্যাসও নয় – ইসলামের শৈশবেতিহাসের কতকগুলো ধারাবাহিক এবং বিচ্ছিন্ন কাহিনী নিয়ে রচিত আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগ সন্দর্ভ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে।[৯]

মীর মশাররফ হোসেনের সমসাময়িক আরো দু'জন মুসলমান সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় সৃষ্টি ধর্মের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, এঁরা হলেন কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) ও মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)। উভয়ের রচনায় মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা প্রাধান্য লাভ করলেও লক্ষণীয় যে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন বিদ্বেষমুক্ত।[১০] কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কায়কোবাদের উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষণশীল মুসলমান দ্বারা নিন্দিত হয়েছে।[১১]

সামাজিক দায়িত্ব পালনের উপায় হিসেবে এই সময়ে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকও সাহিত্য-চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।স্বজাতির

Dhaka University Institutional Repository

অবনতি তাঁর অন্তরকে পীড়িত করেছিল বলেই তিনি তাঁদেরকে ঐতিহ্য সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।[১২] মোজাম্মেল হকের গদ্য রচনার পথ বিচিত্র। তিনি জীবনচরিত ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন এবং পারস্য সাহিত্য থেকে অনুবাদও করেছিলেন।[১৩]

মোজাম্মেল হক রচিত উপন্যাসগুলো হলোঃ (১) 'দারফখাঁ গাজী' (ধর্মমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৯১৯) গঙ্গাভক্ত হিন্দু নর-নারীর পরমপ্রিয় 'দরাফখাঁর গঙ্গাস্তোত্রের' তথাকথিত রচয়িতা ত্রিবেণী-বিজয়ী ধর্মাত্মা জাফর খান গাজীর প্রকৃত জীবনী ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। (২) 'জোহরা' (১৯১৭) উপন্যাসে মুসলমান সমাজের এক বেদনাময় দিকের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে কন্যাপক্ষের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা আজও মেয়ে কিংবা মেয়ের মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে কৌশলে মেয়েকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং জোর জবরদস্তি করে অনেক সময়ে বিয়ে দিয়েও থাকে। এর পরিণাম বর-কন্যা উভয়ের জীবনেই বড়ো ভয়াবহ। সমাজের এ ক্লেদাক্ত পরিবেশে 'জোহ্‌রা'র মতো একটি নিরপরাধ ছোট মেয়ের জীবনে যে দুঃখ ঘনিয়ে এসেছিল, অসাধারণ মমতা দিয়ে মোজাম্মেল হক এ উপন্যাসে তা এঁকেছেন। চিরন্তন মঙ্গল ও অমঙ্গলের দ্বন্দ্বে অমঙ্গলের পরাজয় এবং মঙ্গলের জয় যে অবশ্যম্ভাবী মোজাম্মেল হক তাও এখানে দেখাতে কুণ্ঠিত হন নি। (৩) 'রঙ্গিলাবাঈ' অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত উপন্যাস।[১৪]

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ছিলেন একজন রাজনীতি-সচেতন লেখক। নিষ্ঠার সঙ্গে আজীবন সাহিত্য-চর্চা করলেও তিনি ছিলেন মূলত সমাজ-সংস্কারক ও প্রচারক।[১৫] তিনি পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ শহরে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩১ সালের ১৭ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। মুসলমানের ঘুম ভাঙানো ছিল তাঁর জন্মগত সাধনা। নিপীড়িত মুসলমান জ্ঞানে কর্মে, শিল্পে সভ্যতায় সম্মুন্নত হোক, তাঁর জীবনের এই-ই ছিল ব্রত। এ মানসিকতাই সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'তুরস্ক ভ্রমণ' প্রবন্ধ পত্রে 'আদব কায়দা শিক্ষা', 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' 'সুচিন্তা' 'স্বজাতি প্রেম', 'তুর্কী নারী জীবন' এবং 'স্ত্রীশিক্ষা' 'কারাকাহিনী' (অপ্রকাশিত) প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থে এবং 'রায়নন্দিনী' 'ফিরোজা বেগম' 'তারাবাঈ' এবং 'নূরউদ্দীন' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

শেখ ফজলুল করিমেরও রচনার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে আদর্শ মুসলমান পুরুষ ও নারীর জীবন থেকে।[১৭] তিনি বিশ শতকের প্রথমার্থের একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক। ১৮৮২ সালের ৯ এপ্রিল রংপুর জেলার কাকিনায় শেখ ফজলুল করিমের জন্ম হয় এবং ৫৪ বৎসর বয়সে ১৯৩৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মারা যান। মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পাতা থেকে কিংবা মুসলিম ওলি-আল্লাদের জীবনী থেকে যেখানেই নীতিমূলক ধর্মাখ্যান পেয়েছেন, তা দিয়েই তাঁর সাহিত্যের ইমারত গড়ে তুলেছেন। 'লায়লী মজনু' 'রাজর্ষি এব্‌রাহিম' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি মানবীয় প্রেমের কাহিনীও রচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও শ্লীলতা, ধর্মবোধ ও নীতিজ্ঞান লংঘন করেন নি।[১৮]

উপরি-উক্ত আলোচিত লেখকদের সমকালে আরো কয়েকজন মুসলমান লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এঁদের সকলেরই জন্ম কাজী নজরুলের জন্মের (১৮৯৯) পূর্বে এবং এঁদের রচনাগুলোর প্রকাশ ঘটেছে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যেই।[১৯] এঁদের পরেই কাজী নজরুল ইসলাম যুগস্রষ্টারূপে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হলেন। এঁরা সকলেই 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর অনুরাগের পাত্র।[২০]

সামাজিক কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[২১] রবীন্দ্র-যুগে যে কয়েকজন মহিলা বাংলা সাহিত্য সাধনা করে যশ অর্জন করেন, বেগম রোকেয়া তাঁদের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[২২] তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই আবহাওয়াতেই বেড়ে উঠেন। তাঁর 'অবরোধ বাসিনী' (১৯৩০) গ্রন্থে সাতচল্লিশটি অবরোধ সম্পর্কিত ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় নারী সমাজের অসহায়তার করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে; [২৩] যা পড়তে গেলে অবিশ্বাস্য মনে হয় ও অতিরঞ্জিত ঠেকে।[২৪] তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের মূল বক্তব্য নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। এছাড়াও তাঁর Sultana's Dream (১৯০৮) নামে একটি ইংরেজী পুস্তিকা এবং কিছু সংখ্যক ছোটগল্প ও ব্যক্তিগত রচনা আছে। এ সকল রচনারও মূল কেন্দ্রবিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

নারী। এ থেকেই সুস্পষ্ট যে, নারীকে ঘিরে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন।[২৫] সমাজের এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়া সাহিত্যের মাধ্যমে জেহাদ করে গেছেন। তাঁর সমস্ত লেখাই সমাজ কল্যাণমূলক।[২৬]

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) প্রগতিশীল মানসিকতার অধিকারী ছিলেন।[২৭] শরৎচন্দ্রের মতো পরিচ্ছন্ন চিন্তা তাঁর সমকালবর্তী দুজন মুসলমান সাহিত্যিকের ভেতরে ফুটেছে। তাঁদের একজন খুলনার কাজী ইমদাদুল হক এবং আরেকজন যশোরের লুৎফর রহমান। শরৎচন্দ্র যেমন হিন্দু সমাজের একটি জটিল ক্ষতের ওপর অস্ত্রোপচার করেছিলেন, কাজী ইমদাদুল হক এবং লুৎফুর রহমানও তেমনি বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম সমাজের নানা দোষত্রুটি সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কিত করেছেন।[২৮]

কাজী ইমদাদুল হকের মধ্যে ছিল ঔপন্যাসিকের শক্তি এবং জীবনকে দেখবার মতো তন্ময় অনুধ্যান। তাঁর 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাস উল্লেখযোগ্য মুসলমান সমাজের উপন্যাসই নয়, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেও তার বিশেষ স্থান আছে। এ উপন্যাসে কাজী ইমদাদুল হক বাঙালি মুসলিম সমাজের আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, পর্দা-সমস্যা, অন্ধ পীরভক্তি ও গুরুপূজা এবং ধর্মের নামে সংস্কারপ্রিয়তা প্রভৃতি নানা দোষত্রুটির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন এবং কতকগুলো ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বন করে মুসলমান সমাজের প্রাচীন রোগ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।[২৯] তিনি মুসলমান সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েও যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং যুক্তিসঙ্গত কারণেই বহু-বিবাহের বিরোধী ছিলেন।[৩০]

লুৎফুর রহমানের (১৮৮৯-১৯৩৬) সাহিত্য-চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য মনুষত্বের পরিপূর্ণ উদ্বোধন। তিনি মানুষের অসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই প্রতিটি মানুষের জীবনকে মহৎ করে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তিনি একটি আদর্শ মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন।[৩১] সমাজ হিতৈষী, মানবদরদী এবং সমাজকর্মী লুৎফুর রহমান আদর্শবাদী এবং উপদেশাত্মক রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বর্তমান মাগুরা জেলার পারনান্দুয়ারী গ্রামে লুৎফুর রহমানের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। ব্যবহারিক জীবনে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির নাম- 'প্রকাশ' (১৯১৫), একটি কাব্যগ্রন্থ ; 'সরলা' (বাংলা ১৩২৫) উপন্যাস ; 'উন্নতজীবন'

Dhaka University Institutional Repository

(বাংলা ১৩২৫) উপন্যাস; 'উন্নতজীবন' (১৯২৬),আদর্শবাদী জীবনযাপনের নির্দেশাবলী ; 'রায়হান' (১৯১৯), সামাজিক উপন্যাস ; 'পাথহারা' (১৯১৯) উপন্যাস ; 'উচ্চ জীবন' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত ১৯৬২), আদর্শবাদী রচনা ; 'মহৎ জীবন' (১৯২৬), আদর্শবাদী রচনা ; 'প্রীতি উপহার' (১৯২৭), উপন্যাস; 'ছেলেদের মহত্ত্ব কথা' (১৯২৮), শিশু সাহিত্য; 'রাণী হেলেন' (১৯৩৪), শিশু সাহিত্য; 'বাসর উপহার' (১৯৩৬), উপন্যাস। 'সত্য জীবন' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত ১৯৪০), আদর্শবাদী রচনা। [৩২]

তাঁর 'বাসর উপহার' ও 'প্রীতি উপহার' উপন্যাস আকারে লিখিত প্রবন্ধ। এ দুটোর একটি আর একটির পরিপূরক। 'প্রীতি উপহারে' ভাবী ও ননদের কথোপকথন আর 'বাসর উপহারে' দুই বন্ধুর কথোপকথনচ্ছলে সংসার-জীবনের বিচিত্র পথ পরিক্রমণ করার উপদেশ আছে। স্ত্রীপুত্র, স্বামী-স্ত্রী, পরিবার পরিজনের কার প্রতি কি কর্তব্য তার বিহিত বিধান আছে এ রচনা দুটোতে। 'রায়হান' উদ্দেশ্য ও আদর্শমূলক উপন্যাস। সাহিত্য সমালোচনার মাপকাঠিতে 'রায়হান' যথার্থ উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত নয়। সুতরাং 'রায়হান' কেও উপন্যাস বলা যায় না। চরিত্রগুলোর ব্যাখ্যার কিংবা লেখকের বক্তব্যে আর্ত ও দুস্থদের সেবা, নারী-শিক্ষা এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধ সংক্রান্ত নানা সমস্যাই বর্ণিত হয়েছে ; কেন্দ্রীয় কোনো ঘটনা এবং চরিত্র নেই এ উপন্যাসে।[৩৩] একমাত্র 'সরলা'তেই কিছু উপন্যাসের লক্ষণ আছে। এখানেও ধর্ম ও দেবতার সেবায় উৎসগীকৃত সরলা, নারীর চিরন্তন হৃদয়বৃত্তি প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে মা-বাবার স্নেহাশ্রয় পরিত্যাগ করে পথে বেরিয়ে দেখেছে জীবন তার দুর্বিষহ। আহমদ নামে এক আদর্শবাদী তরুণ মুসলিমের সংস্পর্শে এসে জীবনের স্বাদ সে উপলব্ধি করেছে নতুন করে। সে বন্ধনও তার জীবনে টেকে নি। শেষটায় নানা দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে লেখা-পড়া ও হাতের কাজ শিখে আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ সে পেয়েছে। এ উপন্যাসটিতেও চরিত্র চিত্রণ নেই, আছে শুধু আদর্শ ব্যাখ্যানোপযোগী ঘটনার বর্ণনা।[৩৪]

লুৎফুর রহমান ছিলেন সমাজ, সৌন্দর্য ও মঙ্গল সচেতন সাহিত্যিক। মানুষের অসীম সম্ভাবনার কথা, বাঙালি মুসলমান সাহিত্যেকদের মধ্যে লুৎফুর রহমানের রচনায় প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল।[৩৫] লুৎফুর রহমান নারী-সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'নারীতীর্থ' নামে একটি নারী-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক এবং বেগম রোকেয়া ছিলেন সভানেত্রী।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবহতি পরেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। সেনানিবাসে অবস্থানকালেই তাঁর 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' শীর্ষক একটি গদ্যরচনা মাসিক 'সওগাত' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর প্রকাশিত প্রথম রচনা কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমেই তিনি সমগ্র বাঙালি সমাজের কাছ থেকে কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।[৩৭] তাঁর রচনায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে প্রাধান্য দান করে বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে এ সমস্যাগুলোর ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। এভাবে নজরুল প্রথম জগত ও জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে বাংলা কাব্যকে একটি নতুন যুগে উত্তরণে সহায়তা করলেন।[৩৮] এ-সময়ে কলকাতায় ও ঢাকায় আবির্ভাব ঘটলো দু'টি সাহিত্যিকদলের। 'কল্লোল' (বৈশাখ, ১৩৩০) ও 'কালি-কলম' (বৈশাখ, ১৩৩৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কলকাতার তরুণ সাহিত্যিক দল মূলত ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে একটি নতুন সুরের চর্চা করলেন। এ-সুরের সাধনা ছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নতর হওয়ার সাধনা।[৩৯]

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর যে-কয়েকজন লেখক কথাসাহিত্যে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আবুল হুসেনের (১৮৯৭-১৯৩৮) নাম স্মরণ করা যায়। তিনি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারী (১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২৩ পৌষ) যশোর জেলার পানিসারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৪০] আবুল হুসেনের প্রধান পরিচয় প্রাবন্ধিক হিসেবে। তবে কয়েকটি ছোট গল্প এবং 'মিলন-মঙ্গল' নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটকও রচনা করেছিলেন। 'রুদ্ধ ব্যথা', 'নেশার ফের', 'স্নেহের টান', 'মিনি', 'গোঁয়ার গাদু', 'প্রীতির কুঁড়ি' প্রভৃতি গল্পে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের বিচিত্রমুখী সমস্যাকে তুলে ধরেছেন।[৪১]

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর মুক্তবুদ্ধির আদর্শকে দীর্ঘদিন ধরে সগৌরবে বহন করেছেন আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)। আবুল ফজল ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত কেঁওচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৪২]

আবুল ফজল বিচিত্ররসের লেখক। সর্বত্র সমান সার্থকতার পরিচয় দিতে না পারলেও তিনি সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই বিচরণ করেছেন। গল্প,

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের এই প্রধান শাখাগুলো ছাড়াও তিনি জীবনী, স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী, রোজনামচা প্রভৃতি রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি কবিতা ও অনুবাদও আছে।[৪৩] আবুল ফজল তাঁর লেখক জীবনের সূচনা থেকেই যথেষ্ট সমাজ-সচেতন। বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রগতিবিমুখতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে গিয়ে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' এর অধিকাংশ লেখক প্রবন্ধকেই প্রধান মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ-সময়ে গল্প-উপন্যাসকেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ করেন।[৪৪]

আবুল ফজলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'চৌচির'। 'চৌচির' কে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না বলে বড় গল্প বলাই সঙ্গত। লেখক নিজেই প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় একে 'গল্প' নামে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রথম উপন্যাস রূপে।[৪৫]

মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, মাতৃভাষায় খোৎবা পাঠের আবশ্যকতা, জ্ঞানের দ্বারা কুসংস্কার দূরীকরণ, সুদসমস্যা, চিত্রকলা তথা সুকুমার শিল্পের মূল্য প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা 'চৌচির' এ করা হয়েছে। এর ফলে চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অপেক্ষা লেখকের দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ হয়েছে সমাজ চিত্র অঙ্কনের দিকে। [৪৬]

'চৌচির' ছাড়া আবুল ফজল আরো চারটি উপন্যাস রচনা করেছেন– 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' (১৩৪৭), 'সাহসিকা' (১৩৫৩), 'জীবন পথের যাত্রী' (১৩৫৫) ও 'রাঙ্গা প্রভাত' (১৩৬৪)।[৪৭]

'প্রদীপ ও পতঙ্গ'-এ আবুল ফজলের শিল্প সচেতনতার পরিচয় স্পষ্ট। এ-উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জোহরা। জোহরার মধ্য দিয়ে লেখক একটি চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরেছেন – নারীর পক্ষে মাতৃত্ব সহজাত ও স্বাভাবিক। জোহরা উচ্চ-শিক্ষিতা, সুন্দরী ও পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ায় সে বহু যুবকের আকাঙ্ক্ষিতা। কিন্তু ঘটনার বিচিত্র গতির ফলে তাকে খোকন নামে একটি শিশুর প্রতিপালনের ভার নিতে হয়। খোকন দুশ্চরিত্র যুবক রশীদ ও অসহায়া চাকরানী রাবেয়ার অবাঞ্ছিত ফসল। সুতরাং খোকনের জন্ম-বৃত্তান্ত জানার পর রশীদের প্রতি জোহরার তীব্র ঘৃণা জন্মে। কিন্তু খোকনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

করে শেষ পর্যন্ত রশীদকেই জোহরা স্বামীত্বে বরণ করে নেয়। এভাবে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পছন্দ-অপছন্দকে অতিক্রম করে মাতৃত্ব জয়লাভ করে। কিন্তু রশীদ খোকনের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলে জোহরা তাকে আর সহ্য করতে পারে না। এর পরেই এ-উপন্যাসের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে।[৪৮]

মুসলমান নারী সমাজের মুক্তির প্রসঙ্গকে 'সাহসিকায়'য় প্রাধান্য দান করা হয়েছে। নায়ক জাফর নব্যসমাজের একজন প্রাণচঞ্চল যুবক বলেই সে বিবাহের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা কামনা করে। আর নায়িকা তাহেরা হচ্ছে সেই বাঞ্ছিতা নারী যার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে মুসলমান নারী সমাজের স্বপ্রতিষ্ঠা হবার আকাঙ্ক্ষা। লক্ষণীয় যে, আবুল ফজলের সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বে রচিত এই তিনটি উপন্যাসে মুসলিম-নারী জাগরণের প্রশ্নই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। 'চৌচির'এর রওশন, 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' এর জোহরা এবং 'সাহসিকা'র তাহেরা এই জাগরণোন্মুখ মুসলমান নারী সমাজের তিনজন প্রতিনিধি।[৪৯]

'জীবন পথের যাত্রী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'নারী ও পুরুষ' নামে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী'তে মুদ্রিত হয়েছিল। জাগরণোন্মুখ বাঙালি মুসলমান সমাজের সম্মুখে সুস্থ জীবনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তিনি মামুন, হেনা, হাশিম, মুহসিন, মরিয়ম প্রভৃতি চরিত্রকে আদর্শায়িত করে এ-উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। ফলে চরিত্রগুলো রক্ত-মাংসের মানুষ না হয়ে অনেকটা ভাবের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শিল্প-সচেতন লেখকের পরিবর্তে এ-উপন্যাসে একজন আদর্শবাদী শিক্ষকের দেখা মেলে।[৫০]

এই আদর্শবাদেরই অনেক রূপ 'রাঙ্গা প্রভাত'। আবুল ফজল রোমাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চারখন্ডে একটি বড় উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি। সম্ভবত, 'জাঁ ক্রিস্তফ' এর প্রথম খন্ড 'Dawn' এর অনুসরণে এ উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে 'রাঙ্গা প্রভাত'।[৫১]

খন্ড খন্ড ভাবে রচিত হওয়ায় 'রাঙ্গা প্রভাত' উপন্যাসে পরিকল্পনাগত ত্রুটি থেকে গেছে। তাই উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত পটভূমিতে শুরু হয়েও প্রবাহিত হয়েছে সংকীর্ণ খাতে এবং বহু নাটকীয় ঘটনার জন্ম দিয়ে আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে। পরিবেশ ও উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করে নায়ক কামালের গড়ে উঠার কাহিনী বিবৃত হয়েছে উপন্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও দেশ বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের ভাবাকাশে প্রভাব বিস্তার করায় জীবনধর্মী উপন্যাস হঠাৎ সমস্যা-প্রধান উপন্যাসের রূপ নিয়েছে। লেখক জাতীয়তাবোধ ও মানবতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের দুটি প্রধান সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ধর্মীয় চেতনার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং ধর্ম-পরম্পরা বিবাহের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের স্থায়ী সমাধানে আসা। উপন্যাস শেষ হয়েছে মুসলমান নায়ক কামাল ও হিন্দু নায়িকা মায়ার মিলনের ইঙ্গিত দিয়ে।[৫২]

দেশ বিভাগের পর নতুনদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আবুল ফজল 'রাঙ্গা প্রভাত' রচনা করেছিলেন। তখন শিল্প সৃষ্টির চেয়ে আদর্শ প্রচারের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল বেশী। [৫৩]

আবুল ফজলের প্রথম প্রকাশিত দুটি গল্পের একটি অনুবাদ। গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে 'কল্লোল' (কার্তিক ১৩৩৪) পত্রিকায় 'আরবী গল্প' শিরোনামে। পরবর্তীকালে 'কুফানগরে' নামে সপ্তপর্ণায় সংকলিত হয়। প্রথম মৌলিক গল্প 'ইসলাম কী জয়' এর প্রকাশ ঘটে একই সময়ে 'সওগাত' (কার্তিক ১৩৩৪) পত্রিকায়। গল্পটি পরবর্তীকালে 'জয়' নামে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মাটির পৃথিবী'তে সংকলিত হয়েছে।[৫৪]

আবুল ফজলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'আয়ষা" ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থে 'মাটির পৃথিবী'র নয়টি গল্পের সঙ্গে নতুন চারটি গল্প যুক্ত হয়েছে। তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশিত হয় ১৩৭১ বঙ্গাব্দে। এ গন্থে 'মাটির পৃথিবী' ও আয়ষা'র একুশটি গল্পের সঙ্গে আরো নয়টি নতুন গল্প যুক্ত হয়েছে।[৫৫]

সমাজ জীবনের খন্ড খন্ড চিত্র গল্পের অবয়বে ধরা পড়লেও আবুল ফজল প্রায়শ মুক্তবুদ্ধি ও মানবতার পতাকা হাতে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যরস বিঘ্নিত হয়েছে। ফলে রসসৃষ্টি নয়, সামাজিক সমস্যাই তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৫৬]

আবুল ফজল তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক জীবনের পরিচয় সার্থকভাবেই উদ্‌ঘাটিত করতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্পীর

Dhaka University Institutional Repository

কৌতূহল নিয়ে নয় বরং মানবতাবাদী সমাজকর্মীর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি একটি যুগ ও সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য রচনা করে খন্ডিত জীবনচেতনায় পূর্ণতা দান করেছেন।[৫৭]

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর প্রধান লেখক ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তাঁর রচনা পরিমাণে যেমন বিপুল, প্রকৃতিতে তেমনি বিচিত্রধর্মী।[৫৮] জীবন রসিক ওদুদের চেয়ে জীবন দার্শনিক ওদুদ ছিলেন অনেক বড়। তাই যখন তিনি তাঁর জীবনাদর্শকে কোন রচনার মধ্য দিয়ে রূপায়িত করতে চেয়েছেন তখন শিল্পীসত্তার চেয়ে দার্শনিক সত্তাই প্রধান হয়ে উঠেছে।[৫৯] কাজী আবদুল ওদুদ বাংলা মননশীল সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান সাহিত্যিক যিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনার উর্ধ্বে উঠে তাঁর রচনাকে একটি সামগ্রিক রূপ দান করতে সক্ষম হয়েছেন।[৬০] বাংলাদেশের সাহিত্যিক সমাজে কাজী আবদুল ওদুদের গল্পগ্রন্থের সমাদর লাভের সঙ্গত কারণ এই যে, ইতোপূর্বে বাংলা ছোট গল্পে বাঙালি মুসলমানের জীবন ও চরিত্র এত সুন্দরভাবে রূপায়িত হয় নি। প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্র, কাজী ইমদাদুল হক ও নজরুলের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এঁদের গল্পে মুসলিম জীবনের পরিচয় বিধৃত হলেও কালের দিক থেকে সেগুলো পরবর্তীকালের রচনা। [৬১]

বাংলাদেশের মুসলমান লেখকগণ উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে কবিতা, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের শিল্প-রূপের চর্চা করলেও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ ও মোজাম্মেল হকের মত প্রতিভাবান সাহিত্যিক পরিপূর্ণ শৈল্পিক চেতনার অভাবে তাঁদের রচনাকে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প-গুণান্বিত করে তুলতে পারেন নি। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের লেখক বেগম রোকেয়া, লুৎফুর রহমান, কাজী ইমদাদুল হকের সাহিত্য-রুচি যথেষ্ট উন্নত হলেও তাঁরা কেউই স্বসমাজের কাছ থেকে আনুকূল্য লাভ করেন নি।[৬২] ফলে কথাসাহিত্যে তাঁরা যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হন নি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঃ সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৮৯।

২। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭।

৩। মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,(আধুনিক যুগ) অষ্টম সংস্করণ, ২০০৫, আহমদ পাবলিশিং হাউস ঢাকা, পৃষ্ঠা-৮৫।

৪। মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫।

৫। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮।

৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮।

৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮।

৮। মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭।

৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮।

১০। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-(৬৩-৬৪)।

১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪।

১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪।

১৩। মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯১।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- (৯২-৯৩)।

১৫। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭২।

১৬। মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৯।

১৭। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪।

১৮। মোহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৮।

১৯। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬।

২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬।

২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৭।

২২। মোহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী, আহসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৬।

২৩। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৮।

২৪। মোহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী, আহসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৭।

২৫। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৯।

২৬। মোহাম্মদ আবুদল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৭।

২৭। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৯।

২৮। মোহাম্মদ আবুদল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

২৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫০।
৩০। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৯।
৩১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮১।
৩২। মোহাম্মদ আবুদল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫১।
৩৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫১।
৩৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫২।
৩৫। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮১।
৩৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।
৩৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪।
৩৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৫।
৩৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫।
৪০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৩।
৪১। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৫।
৪২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫৫।
৪৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬০।
৪৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- (৪৬০-৪৬১)।
৪৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬০।
৪৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬১।
৪৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬১।
৪৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- (৪৬১-৪৬২)।
৪৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬২।
৫০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- (৪৬২-৪৬৩)।
৫১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৩।
৫২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৪।
৫৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৫।
৫৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- (৪৬৫-৪৬৬)।
৫৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৬।
৫৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৭।
৫৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৭।
৫৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০৬।
৫৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২১।
৬০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮৭।
৬১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৪।
৬২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

কাজী আবদুল ওদুদের কথাসাহিত্যে বিধৃত সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

কাজী আবদুল ওদুদ প্রাবন্ধিক হিসেবেই বেশী পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, এমন কি কয়েকটি কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'মীর-পরিবার' ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় 'নদীবক্ষে' উপন্যাস। এই দুটো গ্রন্থেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দুটো গ্রন্থের অনেক পরে ১৯৪৮ সালে 'আজাদ' উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং এই উপন্যাসের কাছাকাছি সময়ে গল্প ও নাটিকা সংকলন 'তরুণ' প্রকাশিত হয়। তাঁর সৃষ্টিশীল ধারার অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস-নাটক রচনার এখানেই সমাপ্তি। পরবর্তীতে তিনি মননশীল গদ্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন, তাতেই আমৃত্যু লেগেছিলেন। ফলে 'আজাদ' উপন্যাস আরো কয়েক খন্ড রচনা করার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয় নি; বাস্তবায়িত হলে কথাসাহিত্যে তাঁর অবস্থান আরো সুদৃঢ় হতো। কাজী আবদুল ওদুদের কথাসাহিত্য রচনাকাল বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক, তাই এসব রচনায় সে-সময়কার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির চিত্র এবং সে সাথে লেখকের জীবনবোধের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য পায় হৃদয়ধর্ম, প্রেম-বাৎসল্য, শিক্ষানুরাগ, দানশীলতা-মহানুভবতা, তারুণ্য, আত্মসম্মানবোধ, যুক্তিনিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি যা ছিল তাঁর আজীবন কাম্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ গল্প

মীর-পরিবার

'মীর-পরিবার' কাজী আবদুল ওদুদের ছাত্র-জীবনের রচনা। এটি ১৯১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ময়ীন উদ্‌দীন হুসয়ন, নূর লাইব্রেরী, ১২/১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা।[১]

'মীর-পরিবার', 'আশরাফ হোসেন', 'করিম পাগলা', 'হামিদ', 'আবদুর রহিম' এই পাঁচটি গল্প নিয়ে 'মীর-পরিবার' গল্পগ্রন্থ। গল্পগুলোর রচনাকাল ১৩২৪-২৫। বইটি সম্পর্কে ১৩২৭ বৈশাখের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা মন্তব্য করে —

> ...আবার জোর গলায় বলছি যে, কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের এই প্রথম পুস্তকে তুষ-চাপা আগুনের মতো এমন এক স্পষ্ট প্রতিভার আঁচ পাওয়া যায় যা আর কোন মুসলমান লেখকের মধ্যে পাই নি।[২].....

কাজী আবদুল ওদুদের কাছে ২০/০৩/১৮ তারিখে শিবপুর (হাওড়া) থেকে লিখিত এক পত্রে শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন ——

> দিন দুই হইল আপনার পত্র এবং 'মীর-পরিবার' পাইয়াছি। ..... আজকালকার দিনে গল্প পড়িয়া আনন্দ পাওয়া এবং সুখ্যাতি করিতে পারা দুই-ই যেন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বই উপহার পাইয়া গ্রন্থকারকে দু'টা ভাল কথা বলিতে, সর্ব্বান্তঃকরণে উৎসাহ দিতে পারি না বালিয়া আমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। আপনি সেই সুযোগ আমাকে দিয়াছেন বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সত্যিই আমি ভারি খুশী হইয়াছি। এই আপনার প্রথম চেষ্টা হইলে ভবিষ্যতে যে আপনার কাছে অনেক

Dhaka University Institutional Repository

> বেশী আশা করা যায় তাহা বলাই বাহুল্য। আপনার রচনার মধ্যে যে উর্দু কথা ব্যবহার করিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। তা না হইলে মুসলমান পাঠক-পাঠিকা কখনই ইহাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহাদের কেবলই মনে হইত ইহা হিন্দুদের ভাষা, আমাদের নয়। এই পাশাপাশি দুই জাতির মধ্যে সাহিত্যের সংযোগ সাধনের বোধ করি ইহাই সবচেয়ে ভাল উপায়। [৩]

'মীর-পরিবার' সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিশির কুমার দাশ তাঁর 'বাংলা ছোটগল্প, ১৮৭৩-১৯২৩' গ্রন্থে বলেন ——

> বিভিন্ন পত্রিকাতে বিভিন্ন লেখকেরা মুসলমান জীবন ও সমাজ নিয়ে লেখার প্রচেষ্টা করেছিলেন মাত্র- কিন্তু কোন সার্থক সৃষ্টি তখনও হয় নি। কাজী আবদুল ওদুদের 'মীর-পরিবার' (১৯১৮) গ্রন্থটি সেই দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব চরিত্র বাস্তব-জীবনানুগই শুধু নয়, মুসলমান চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এত স্পষ্ট রেখায় আঁকা হয় নি। [৪]

'মীর- পরিবার' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক গল্পগুলো সম্পর্কে বলেছেন ——

> সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার মুসলমানের ছবি আভাসে ইঙ্গিতে এ-তে যা' ফুটেছে আজ ত'ার অনেক অদল- বদল-এমন-কি ওলট-পালট হ'য়েছে; সে-কথা বুঝবার মতো লোকও আজকার পরিবেশে বেশী নেই। কিন্তু সাহিত্যিক রুচির অপরিহার্য গতি সত্যাশ্রয়িতার দিকে; সেই সত্যাশ্রয়িতা যেন কতকটা অজানিতভাবে আপন স্বাক্ষর রেখে গেছে এই সহজ সরল রচনাগুলোর মধ্যে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

২

'মীর-পরিবার' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'মীর-পরিবার' গল্পটি দুটি অংশে বিভক্ত, প্রথম অংশ 'সেকাল' আর পরবর্তী অংশ 'একাল'। 'সেকাল' অংশ মীর ভাইদ্বয়ের জীবন-কথা এবং 'একাল' অংশ তাঁদের পুত্র-কন্যাদ্বয়ের প্রণয়কাহিনী। প্রায় দুই দশকের ব্যবধানে একটি মুসলমান পরিবারে মূল্যবোধের যে বিবর্তন ঘটেছে লেখক এই গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা চিত্রিত করেছেন।

গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে আধা-সামন্তবাদী পরিবেশে। তারা ভূমি-নির্ভর কিন্তু সরাসরি কৃষি সম্পৃক্ত নন। মীর সাহেবেরা দুই ভাই। মীর বক্তিয়ার হোসেন বড় ভাই আর মীর আলী আকবর ছোট ভাই। বক্তিয়ার সাহেব হচ্ছেন সংসারের কর্তা। ছোটভাই আলী আকবরের বিষয় সম্পত্তির প্রতি তেমন লোভ-লালসা ছিল না – তাই তিনি বড় ভাই বক্তিয়ার সাহেবের উপর সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজেদের গ্রামের এবং অন্যান্য নিকটবর্তী গ্রামের লোকজনের নানা হিতকর কাজে সময় ব্যয় করতেন। বড় ভাই হবেন সংসারের কর্তা তা বাঙালি সমাজের দীর্ঘ দিনের রেওয়াজ। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই গ্রামের নাম বিলাসপুর। এখানে হিন্দু-মুসলমান, ভদ্র–অভদ্র প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের বাস। আকবর সাহেব ছিলেন সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মনের মানুষ। তাই তিনি সবার বিপদেই সাহায্য সহযোগিতা করতেন। এভাবে লোকের উপকার করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁর নিজের তহবিলও শূন্য হয়ে যেত। মীর বক্তিয়ার সাহেবের স্ত্রী রওশন আরা আদর্শ নারী, যেন বেগম রোকেয়ার ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে এই চরিত্রে ; তাঁর আদর্শেই আলী আকবর অনুপ্রাণিত ও আদর্শায়িত। রওশন আরা বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন এবং তাঁর অন্তঃকরণও বড় ছিল। তিনি সমাজে, পরিবারে ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধন। রায়তের মেয়েদের ঝগড়া-বিবাদ হলে এত সুন্দরভাবে তিনি তা মীমাংসা করে দিতেন যে কারো কিছু বলার থাকত না। এ ধরণের দুলর্ভ গুণের জন্য তিনি সকলের পরম শ্রদ্ধার পাত্রী এবং সকলের কাছে 'বিবিমা' নামে পরিচিত ছিলেন। মেয়েদের ঝগড়া-ঝাটি এবং তা মীমাংসার যে সংবাদ এই গল্পে পাওয়া যায় তা গ্রাম বাংলার চিরন্তন ঘটনা।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সমাজে ছোটবেলায় বিয়ে ঠিক করে রাখার প্রচলন ছিল। বক্তিয়ার সাহেবের বড় ছেলে ইউসুফ আর আকবর সাহেবের কন্যা সুফিয়া। সুফিয়ার জন্ম হলে লুৎফুন্নিসা, রওশন আরার হাত ধরে কথা দিতে বলে, বড় হলে ওদের দুজনের বিয়ে দিবে। লেখকের ভাষায় ——

> কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে লুৎফুন্নিসা রওশন আরার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বুবু, আমার একটা কথা রাখতে হবে-, ইউসুফের সাথে আমার সুফিয়ার বিয়ে দেব।" রওশন-আরা নবজাত সুফিয়াকে কোলে লইয়া বলিলেন, "খোদা ওদের বাঁচিয়ে রাখুন, আর আমরা সেই বিয়ে দেখে যেতে পারি, এ দোয়া মাগ্।"[৬]

গ্রাম-বাংলার মানুষের আন্তরিকতার ছবিই এখানে ফুটে উঠেছে।

মীর ভাইদ্বয়ের পিতা মোহাম্মদ আবেদ সাহেব দেশ বিখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি নিজের বুদ্ধিকৌশলে বহু শত্রুর হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ করে যেতে পারেন নি। তা হলো এই অঞ্চলে একটা এন্ট্রান্স স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, যা পরবর্তীতে তাঁরই উত্তরাধিকারী বড় পুত্রবধূ রওশন আরার উদ্যোগে ও আলী আকবরের প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হয়। আবেদ সাহেব রওশন আরার কাছে মৃত্যু সময় আড়াই হাজার টাকা রেখে যান, এই অঞ্চলে বড় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তার সাহায্যার্থে ব্যয় করার জন্য। এখানে বাঙালি সমাজে পারিবারিক সম্পর্ক সে-সময় কতটুকু মজবুত ছিল তারই আভাস পাওয়া যায়। রওশন আরা তাঁর শ্বশুরের অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য ধ্যান-জ্ঞান উজার করে কাজে নেমেছিলেন যার ফলে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। আবেদ সাহেব, আলী আকবর, রওশন আরাকে বাঙালি মুসলমান সমাজে শিক্ষানুরাগীদের প্রতিনিধি বলা যায়। সে-সময় বাঙালি মুসলমানেরা লেখা-পড়ার দিকে মনোযোগ দিয়েছে বলেই আকবর সাহেব ও রওশন আরা বিলাসপুর অঞ্চলের ও আশে-পাশের গ্রামের লোকদের কাছ থেকে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা উঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। আকবর সাহেব কথায় তা সম্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ——

> খুব চেষ্টা করলে হদ্দ আড়াই হাজার টাকা উঠতে পারে, তাও আজকাল লেখা-পড়ার দিকে লোকের খেয়াল গেছে বলে এতটা সাহস করছি।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

রওশন আরা তাঁর শ্বশুরের দেয়া আড়াই হাজার টাকা আর নিজের তহবিলে জমানো টাকা নিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হন। তিনি খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতি মহিলা তাই কৌশলে সবাইকে নিয়ে কাজটি সম্পন্ন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কারণ ভালো কোন কাজ করতে গেলে সমাজের দশজনকে সাথে নিয়ে করতে হয়। তা না হলে জেদাজেদির কারণে অনেক সময় কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। এটি রওশন আরার বাস্তব-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মনে হয়েছে। কারণ এটি গ্রাম-বাংলার অতি পরিচিত ঘটনা। এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছেন বলেই দশজনকে ডেকে সভা করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। রওশন আরার কথায় তা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় —

> মনে করলে, খোদার দোয়ায়, আমরা নিজেরাই যে টাকা দিয়ে অন্ততঃ টিনের ঘর তুলে একটা এন্ট্রান্স স্কুল করতে না পারি তা নয়। তবে কথা কি, দশ জনের টাকা দিয়ে স্কুল তৈরি হলে তার উপর সকলেরই একটা মমতা থাকবে- সামান্যের জন্য কেউ নষ্ট হতে দিতে চাইবে না। তাই তোমাকে সবার কাছ থেকে টাকা তুলতে বলছি। [৮]

রওশন আরা শুধু আকবর সাহেবকে স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে লাগিয়েই ক্ষান্ত হন নি। তিনি তাঁর স্বামী বক্তিয়ার সাহেবকেও এ-কাজে নামিয়ে ছাড়লেন। বক্তিয়ার সাহেব এই অঞ্চলের গণ্য-মান্য ব্যক্তি, তাঁর কথা কেউ সহজে ফেলতে পারবে না তাই তাঁকে দিয়েই চাঁদার ফর্দ তৈরি করান। বক্তিয়ার সাহেব বড় বড় হিন্দু-মুসলমানের নাম লিখে চাঁদার ফর্দ তৈরি করলেন । রওশন আরা তাঁর স্বামীকে জোর করে নিজের নামে এক হাজার টাকা চাঁদা লিখালেন। এতে তাঁর সমকক্ষ দুর্গাদাস রায় মহাশয় নানা আপত্তি করেও আটশ টাকার কম লিখাতে পারেন নি। অন্যান্য হিন্দু-মুসলমানদের চাঁদার পরিমাণ বক্তিয়ার সাহেব ও রায় মহাশয় মিলে ধরে দিলেন। এতেই বোঝা যায় যে, সে-সময়কার সমাজে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি বজায় ছিল যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাজী আবদুল ওদুদ এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিলাসপুরে স্কুল প্রতিষ্ঠা হলে, সবাই রওশন আরার নামেই স্কুলের নামকরণ করা যথাযথ মনে করেন। কিন্তু রওশন আরা তাতে খুশি হন নি। তাঁর বক্তব্য ——

> "দেখ, তোমরা যে আমাকে মনে মনে একটু ভাল জান সেই ত আমার ঢের। বাইরের এত নাম-ডাকে আমার দরকার কি ? আমার কাজের জায়গা অন্দর মহলে, আমার সুনাম-সম্মানটা লোকের মনের অন্দরমহলে থাকাই আমি পছন্দ করি।"[৯]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় যে, সে-সময়কার সমাজে তখনও নারী জাগরণের ছোঁয়া লাগে নি। বাঙালি মুসলমান নারীরা তখনও অন্দরমহলে থাকতে পছন্দ করেছে তার নিখুঁত চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। নারীদের স্থান ছিল অন্দর মহলে তাই শিক্ষা-দীক্ষায়ও তারা অবহেলিত হয়েছে। এই গল্পে সুফিয়ার পড়া-লেখার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না, অথচ তার চাচাত ভাই ইউসুফ কলকাতায় এম. এ. পড়ছে তার উল্লেখ আছে। গল্পে সুফিয়ার উক্তিতে তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।সুফিয়ার উক্তি ——

> ভাল করে লেখাপড়া শেখা হয়নি ; শেলাইয়ের কাজ, রান্না-বাড়া – আরো কত কিছু শেখা বাকি আছে ; কিন্তু সেজন্য আমার একটুও দুঃখ হয় না।[১০]

সুফিয়া একটু বড় হলে ইউসুফের সামনে বের হতে বাঁধা নিষেধের সম্মুখীন হয়েছে; যা আমাদের সমাজে মেয়েদের উপর অভিভাবকরা সব সময় চাপিয়ে দেয়। তখনও এই নিয়ম-নীতির প্রচলন ছিল; কিন্তু নব্য শিক্ষিত ইউসুফ তা মেনে নেয় নি, সে হাত ধরে সুফিয়াকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। এতে কোন অশালীনতা প্রকাশ পায় নি, ভাই-বোনের অধিকারবোধ থেকেই ইউসুফ তা করেছে। ইউসুফ বি.এ. পাশ করে কলকাতায় এম.এ. পড়ছে এই সংবাদ গল্পটিতে পাওয়া যায়; তবে কলকাতায় পড়তে যাওয়া ছেলের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল তখনকার সমাজে – যা শুধু আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আতরাফ শ্রেণীর মুসলমানেরা এর নাগাল থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছে। এই শিক্ষার দ্বারা তাদের রুচিরও

Dhaka University Institutional Repository

অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইউসুফের বাবাকে লেখা চিঠিতে মার্জিত ও রুচিশীল বক্তব্য লক্ষ্য করা যায় ——

> মাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, তাঁর আদর-যত্নের জন্য আমি আজীবন তাঁর কাছে ঋণী, কিন্তু আমার বিয়ে সম্বন্ধে তাঁর ইচ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারব না। কারো মনে কষ্ট দেওয়া আমার আদৌ ইচ্ছা নয় ; কিন্তু এবার দেখছি, আমার কাজে একজনের মনে একটু কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। [১১]

এই শিক্ষা-দীক্ষার ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজ কৃষি-নির্ভরতা কাটিয়ে চাকুরীর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ইউসুফের প্রতি বক্তিয়ার সাহেবের উপদেশে সে রকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বক্তিয়ার সাহেবের উপদেশ ——

> এ সব সাংসারিক কাজ নিয়ে বেশী তোলাপাড়া করবার দরকার নেই। এম,এ, পরীক্ষাটা ভাল করে পাশ করতে চেষ্টা করবে, তাতে অনেক সুবিধা হবে। [১২]

ইউসুফ নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত তাই তার মধ্যে ব্যক্তিগত অভিমতের জন্ম হয়েছে; যা তার সৎমার বক্রোক্তিতে প্রকাশ পায়। তার সৎমার উক্তি ——

> এখনকার ধন্যি ছেলেরা বটে, নিজেদের বিয়ে নিজেরাই ঠিক ক'রে রাখে। [১৩]

'সেকাল' আর 'একাল' এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে মীর-পরিবারের জন্য যে ভয়ঙ্কর সংবাদ অপেক্ষা করছে তা হচ্ছে রওশন আরার মৃত্যু। রওশন আরা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সে-সময়ে কলেরা হলে গ্রামের পর গ্রাম তা দ্বারা আক্রান্ত হতো ফলে অসংখ্যা মানুষের প্রাণ-হানী ঘটত। রওশন আরার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। রওশন আরার মৃত্যুর এক বৎসর পর বক্তিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সাহেব পুনরায় বিয়ে করেন। নতুন-বৌ এর সাথে কারো সুসম্পর্ক গড়ে উঠে নি। তিনি ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে বেশী উদ্‌গ্রীব থাকায় সমষ্টিগত স্বার্থ তাকে স্পর্শ করে নি। তাই কৌশলে স্বামীকে দিয়ে সংসার পৃথক করে নেয়। ফলে মীর-পরিবারের দুই ভাইকে ভিন্ন হাড়ীর ভাত খেতে দেখা যায়। লেখক এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, একজন আদর্শবাদী নারীর প্রভাবে এই পরিবারটি যেমন শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তেমনি এই নতুন-বৌ এর কুটিলতার কারণে পরিবারটি ভাঙতে বসেছে। অর্থাৎ সে-সময়কার সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। নতুন- বৌ শুধু সংসার পৃথক করেই ক্ষান্ত হয় নি। সে ইউসুফ-সুফিয়ার স্বাভাবিক মেলা-মেশাকেও ভালোভাবে নেয় নি। কারণ তার ইচ্ছে ইউসুফের সাথে তার ভাই-ঝিকে বিয়ে দিবে। কিন্তু নব্য শিক্ষিত ইউসুফকে বশ মানাতে ব্যর্থ হয়েছে তার সৎ মা। কারণ ইউসুফ যৌথ পরিবারের মধ্যে জন্মেছে, বড় হয়েছে, তাই যৌথ পরিবারের ছায়া তার উপর রয়েছে। সে জন্য ইউসুফ তার সৎ মাকে উদ্দেশ্য করে বলে ——

"ও ঘরে যে চাচা আছে, ওখানে পর কে ? [১৪]

তৎকালীন বাঙালি মুসলমানেরা যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করেছে, গল্পকার তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে – বিশেষ করে আকবর সাহেব, রওশন আরা, সুফিয়ার মধ্য দিয়ে। আলী আকবর সাহেব আল্লাহ বিশ্বাসী এবং পরপোকারী মানুষ, তাই তিনি মনে করেন লোকের উপকার করে বাহাদুরী দেখানোর কিছু নেই। তাঁর কথা, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে চুপ চাপ বসে থাকলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত বলে দাবী করব কি করে ? এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষের বিপদে-আপদে নানা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তিনি মূলত রওশন আরার আলোতেই আলোকিত এবং তাঁর উৎসাহই আলী আকবর সাহেবের শক্তি। রওশন আরার মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর উক্তি ——

খোদার দরগায় হাজার শোকর, তিনি আমাদের মুখ রেখেছে। এখন স্কুলটা তৈরী হয়ে জমে উঠেছে দেখলেই দেল ঠান্ডা হয়।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়া, ইউসুফকে পাবার জন্য আল্লাহর কাছে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করেছে ——

> শেষে একদিন আমাদের পাড়ার ওস্তাদ-মা'র মুখে শুন্‌লাম- 'শবে-কদরে'র রাত্রে বিশেষ কয়েকটি 'সুরা' ও 'দোয়া দরুদ' দিয়ে কয়েক রাকাত নামাজ পড়ে' খোদার কাছে যে মোনাজাত করা যায় তাই-ই কবুল হয়। তাঁর কাছে সব শিখে নিয়ে তাঁর নির্দ্দেশ-মতো নামাজ পড়ে মোনাজাত করলাম। আরো একবার সে নামাজ পড়ে' আমার জীবনের বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করেছি। এতেই আমার সব ভাবনা দূর হয়ে গেছে। এখন আমার খুব জোর বিশ্বাস এই যে, খোদার কালামকে রদ করে, কোনো মানুষের এমন সাধ্য নাই। [১৬]

সে-সময়কার বাঙালি মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদ যে পুরোপুরি দূর হয় নি তার সংবাদ পাওয়া যায় সুফিয়ার কথার মধ্য দিয়ে——

> কিন্তু আমার বিয়ে ত কিছুতেই অন্যত্র হতে পারে না ; অথচ বাপজান যদি সব ঠিক-ঠাক করেই ফেলেন, তবে সেই বিয়ের মজলিসে আমার অসম্মতির কথা রাষ্ট্র হলে যে বড় কেলেঙ্কারি হবে! আমি ত শুধু সুফিয়া নই – আমি মীর বংশের সন্তান, আকবর সাহেবের কন্যা। যাতে আমার বংশে অপমানের ছাপ লাগে, যাতে আমার পিতার উঁচু মাথা নীচু হয়ে যায়, এক্ষেত্রে এত বড় ভয়ঙ্কর কাজ না করেও ত আমি রক্ষা পেতে পারি।[১৭]

পরিশেষে বলা যায় যে, মীর-পরিবার মূলত বাঙালি মুসলমান সমাজের ভূমি-নির্ভর ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র। গ্রাম-বাংলায় এই একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যাধিক্য ছিল, কিন্তু যুগ পাল্টাবার সাথে সাথে তা ক্ষয়ে যেতে বসেছে। অর্থাৎ একক পরিবারের জন্ম হচ্ছে, সমাজের পরিবর্তন হচ্ছে, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মনোযোগ বাড়ছে, ফলে

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি-নির্ভরতার পরিবর্তে চাকুরী-নির্ভর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী একটি শ্রেণীর উন্মেষ ঘটছে। সমাজের এই বিবর্তনের ধারাকেই কাজী আবদুল ওদুদ এই গল্পে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

৩

'আশরাফ হোসেন' 'মীর-পরিবার' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প। আলিগড়ের নব্য শিক্ষিত যুবক আশরাফ হোসেনের প্রণয়-বিবাহ, দাম্পত্য সুখ-দুঃখ ও স্ত্রীবিয়োগ নিয়ে এ গল্প। গল্পটি বাঙালি মুসলমানের সমাজ-বিবর্তনের একটা ধারাকে স্পর্শ করে ভিন্ন একটি শাশ্বত ব্যক্তিজীবনকে প্রকাশ করে। আধা-সামন্ত শরাফতির মোহমুগ্ধতার ভেতর থেকে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানেদের চাকুরি-নির্ভর যে নব্য নাগরিক জীবন বিশ শতকের গোড়ার দিকে শুরু হয়, তারই একটি বিশ্বস্ত রূপায়ণ-এ গল্প। [১৮]

এই গল্পের নায়কের নাম আশরাফ হোসেন। মফিজউদ্দিন সাহেবের পুত্র আশরাফ বি.এ. পাশ করে বাড়ি এলে তার পিতা-মাতা তার মতামত না নিয়ে তার পিতার বন্ধু মুন্‌শি আফতাবউদ্দিনের কন্যা শাহেদার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে। যদিও আশরাফ বহু আগে থেকেই এই বিয়ের কথা শুনে এসেছিল তবুও এ সংবাদ তাকে হতভম্ব করে, কারণ উচ্চ-শিক্ষা নিতে গিয়ে আশরাফের রুচির অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ফলে এই অবস্থায় স্বল্প শিক্ষিতা শাহেদাকে তার সাথে বড় বেমানান লাগে। নিজের বিয়ে সম্বন্ধে আশরাফের যে নিজস্ব মতামত গড়ে উঠেছে; তা এখানে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আশরাফের উক্তি ——

কৈ কেহই ত তাহাকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে নাই।[১৯]

আশরাফের শিক্ষিত রুচিবোধ থেকে এই প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। আর ছেলের এই রুচির পরিবর্তন দেখে তার মায়ের মুখে শুনতে পাওয়া যায় ——

একালের ছেলেদের মতিগতি বুঝে ওঠা ভার। [২০]

Dhaka University Institutional Repository

আশরাফ আলিগড়ে লেখা-পড়ার করার সময় বন্ধু শামসুজ্জোহার বোন শামসুন্নাহারের প্রতি প্রেমাসক্ত হয় এবং চাকুরী পেলে তাকে পাবে এই আশায় দিন গুনতে থাকে। তার চাকুরিও হয় ঠিকই কিন্তু তার কাঙ্ক্ষিত ডিপুটি চাকুরী লাভের আনন্দের সংবাদ বিষাদ হয়ে যায়, শামসুন্নাহারের বিয়ের দাওয়াত পেয়ে। বুনিয়াদি ঘরের শিক্ষিতা শামসুন্নাহারের বিয়ে ঠিক হয় ঢাকার এক জমিদারের সঙ্গে। এই সংবাদে আশরাফের উজ্জ্বল জীবন যেন এক মুর্হূতেই দুর্যোগের কালো মেঘে ঢেকে যায়। পরে সে নিজেকে খুব কষ্টে সামলে নিয়েছে কিন্তু চাকুরী-জীবন একা কাটানো তার জন্য নিদারুণ কষ্টের হয়ে উঠেছিল। জীবনে অনেক কাজ করবে বলে তার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সে বিশ্বাসের সুরে তার জীবন-বীণা তেমন ঝঙ্কার দিয়ে উঠত না । অন্তরে একটা অভাব সে অনুক্ষণ অনুভব করে। তাই এই অবস্থায় সে শাহেদাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। আশরাফের ধারণা ছিল একটু চেষ্টা করে ঘরে রীতিমত লেখা-পড়া শেখালে শাহেদাই তার উপযুক্ত স্ত্রী হবে। সেই বিশ্বাস নিয়েই আশরাফ বিয়ে করতে যায় এবং বিয়ের দিনে শাহেদার মুখ দেখার পর থেকে শাহেদা সম্বন্ধে তার সব মিথ্যা সংস্কার ভেঙে গিয়ে নতুন আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু স্বল্প শিক্ষিতা শাহেদার সংকোচবোধের জন্য আশরাফের মধ্যে অভিমানের বীজ ব্যপ্ত হয়। শাহেদা বুঝতে পারে নি তার দুর্ধষ স্বামীর প্রতি কী তার কর্তব্য। এই অজ্ঞতার কারণে আশরাফ তার প্রতি বিমুখ হয়েছে। একদিন আশরাফের সব ভুল ভাঙে, সেদিন থেকে আশরাফ শাহেদাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে।তার এত যত্ন-ভালোবাসাতেও সন্তান সম্ভাবা শাহেদা সেরে উঠে নি। সে সবাইকে ছেড়ে চলে যায়। তার এই মৃত্যুতে আশরাফও নিঃস্ব ও অবলম্বনহীন হয়ে পড়ে।

আশরাফ হোসেন শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের সেই-সময়ের প্রতিনিধি। সে বেড়ে উঠেছে আধা-সামন্ত ভিত্তিভূমিতে, বিকশিত হয়েছে বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে। নব্য শিক্ষিত যুবক আশরাফ সমাজের জন্য কিছু করার চিন্তা করেছিল তাই সে আলিগড় থেকে বি,এ পাশ করে এসে তাদের গ্রামের কাছে একটি এন্ট্রান্স স্কুলের ছেলেদের নিয়ে নানা কাজে লেগে যায়। আশরাফ তাদের নিয়ে মুসলমানদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে। মুসলমানদের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে প্রত্যেক মুসলমানকে মন-প্রাণ দিয়ে সমাজের জন্য কাজ করে যেতে হবে – এসব কথা সে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে উচ্চরণ করে। আশরাফের মধ্যে ধর্মীয়-

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। লেখকের ভাষায় ——

> দূর গ্রামের আজান-ধ্বনি চিক্কণ হইয়া আসিয়া তাহার কানে পৌঁছিল; তাহার যেন চমক ভাঙিল। সে নামাজ পরিবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া চলিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া ওজু করিয়া নামাজে দাঁড়াইল।[২১]

শামসুন্নাহারের প্রতি আশরাফের বায়বীয় প্রেম মধ্যযুগীয় প্রণয়বিলাসকেই নির্দেশ করে ; স্ত্রীকে যথার্থ বুঝতে চেষ্টা না করার মধ্যেও সে ধরনের প্রবণতা ধরা পড়ে। আশরাফ হোসেন সামন্তবাদী পরিবেশে বড় হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার মানসিক বিকাশ ঘটেছে বুর্জোয়া মূল্যবোধে। ফলে সামন্ততান্ত্রিকতা পেরিয়ে এই বুর্জোয়া মানবতাবাদে উত্তরণে তাকে দোলায়মান দেখতে পাওয়া যায়। এই দোলায়মান বৃত্তিই আধুনিক বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ইঙ্গিত প্রদান করে। কারণ সে-সময় বাঙালি মুসলমানেরা কৃষি-নির্ভরতা কাটিয়ে চাকুরি-নির্ভর হতে থাকে এবং গ্রাম ছেড়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য নগরে ভিড় জমায়। এই নগর-জীবন, শিক্ষা ক্রমাগত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে রুচির পরিবর্তন ঘটায়। ফলে সমাজের প্যার্টাণে পরিবর্তন হতে থাকে। একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে শুরু করে, মানুষ শহরকেন্দ্রিক হতে আগ্রহী হয়, ফলে সামন্তবাদী সমাজ থেকে বুর্জোয়াবাদী মূল্যবোধে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই ক্রমাগত পরিবর্তনে বাঙালি মুসলমান সমাজে সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আশরাফ হোসেন চরিত্রের মধ্য দিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ সেই সংকটকে তুলে ধরেছেন। কারণ তার মধ্যে দ্বৈতধারার ছাপ স্পষ্ট।

তখনকার বাঙালি মুসলমান সমাজে নারী-শিক্ষা অনেক পিছিয়ে ছিল তার পরিচয়ও এই গল্পে পাওয়া যায়। শাহেদা স্বল্প শিক্ষিতা তা গল্পের শুরু থেকেই শুনতে পাওয়া যায়। শামসুন্নাহারের প্রাতিষ্ঠানিক কোন লেখা-পড়ার খবর জানতে পারা যায় না। শামসুজ্জোহার স্ত্রী বাংলা, উর্দু জানত এতটুকু খবরই পাওয়া যায়। কারণ সে তার স্বামীকে বাংলা ও উর্দু কবিতা তুলে দিয়ে চিঠি লিখত। অর্থাৎ নারী -শিক্ষা তখনও বাঙালি মুসলমান সমাজে

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্ব পায় নি। সে সাথে নারী যে সে-সময়কার সমাজে অবরোধবাসিনী তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এই গল্পে। কারণ সুদূর আলিগড়ে বাংলাদেশের ভিন্ন জায়গার দুজন বাঙালি আশরাফ ও শামসুজ্জোহার মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সেই বন্ধুত্বের সূত্রধরে আশরাফ কয়েকবার শামসুজ্জোহাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। ছেলের একমাত্র বন্ধুকে শামসুজ্জোহার মা নিজ হাতে তুলে খাওয়াতেন কিন্তু শামসুন্নাহার আশরাফের সামনে বের হয় নি। আড়াল থেকে তার পায়ে 'ছরের' ঝন্‌ঝনি ও গহনার মধুর ঠুন ঠুন শব্দ, আর কবাটের ফাঁকে তার কারুখচিত ঢাকাই শাড়ীর ঈষৎ অঞ্চলপ্রান্ত আশরাফের দৃষ্টির কৌতূহল বৃদ্ধি করে দিত। কিন্তু শামসুন্নাহারকে সে কখনও দেখতে পায় নি। এখানে সে-সময়কার সমাজে বাঙালি মুসলমান নারীদের পোশাক ও সাজগোজের চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি নারীর অবরোধের চিত্রও ফুটে উঠেছে। নারীর স্থান তখনও অন্দর মহলেই শোভা পেত।

তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের সরকারী চাকুরী পেতে হোমরা-চোমরাদের সুপারিশের প্রয়োজন হতো তারও পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পে। আলিগড়ে পড়া-লেখা করার সময় অনেক সাহেবের সঙ্গে আশরাফ হোসেনের পরিচয় হয়। তাই বি.এ. পাশ করে বাড়ি আসার সময় তাদের সাহায্যে কতগুলি ভালো-ভালো সুপারিশ পত্রের যোগাড় করতে পেরেছিল। সেজন্যই বাড়িতে এসে চাকুরীর চেষ্টায় তাকে খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি। তাই যথাসময়ে ডিপুটির তালিকায় আশরাফ হোসেনের নাম দেখা যায়। অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের বহু কাঙ্ক্ষিত ডিপুটিগিরি সে লাভ করে।

তৎকালীন সমাজে বিয়ের বরযাত্রার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে ডিপুটি আশরাফ হোসেনের বিয়ের বরযাত্রার মধ্য দিয়ে। পাল্কি, ঘোড়া, হাওয়াই-বাজি, ব্যান্ড ইত্যাদি ঘটা করে যথাসময়ে বরযাত্রীগণ সু-সজ্জিত আশরাফকে নিয়ে যাত্রা করে। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে পাল্কিতে করে বৌ নিয়ে আসার প্রচলন প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমানেরাও সে-সময় ধুতি পড়ত তারও পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পে। যা এখন শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লেখকের ভাষায় ——

> শাহেদা উঠিয়া গিয়া তাহার অন্য জুতা আনিয়া দিল। আশরাফ বাধা দিয়া বলিল, "থাক, আমিই নিচ্ছি।" শাহেদা আলনা হইতে তোয়ালে ধুতিও আনিয়া দিল।[২২]

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে লোক খাওয়ানোর প্রচলন বহু আগে থেকেই ছিল। কোন ভালো সংবাদে লোক খাওয়ানো রীতিমত রেওয়াজে পরিণত হতে দেখা যায়। এই গল্পেও তাই দেখতে পাওয়া যায়। লেখকের ভাষায় ——

> তাহার চাকুরী লাভের শুভ সংবাদে তাহার পিতা বন্ধু-বান্ধব রায়ত জন আত্মীয় স্বজন ডাকাইয়া এক ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন আশরাফ নিজে বলিয়া এই ভোজের আয়োজন আরো বাড়াইয়া দিল। [২৩]

গল্পটিতে মূলত মুসলমান প্রধান অঞ্চলের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, প্রচলিত-প্রথা, প্রাত্যাহিক জীবনের বর্ণনা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

৪

'মীর-পরিবার' গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'করিম পাগলা'। গল্পটি পাগল বলে কথিত দুঃখী দিন-মজুর, সহায়, সম্বলহীন, পরিজনহীন করিমের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের কাহিনী। করিমের চলাফেরা অন্যান্য দশজনের সাথে সমান তালে মিলত না বলে সবাই তাকে পাগল বলে আখ্যা দিয়েছিল। তার সুখের যোগান দিত তার রসের গান। কৃষক কুলের নব্য যুবক সম্প্রদায়ের কাছে তার এই গানের খুব কদর ছিল। ফলে গ্রামে করিমের একটি গানের আসর গড়ে ওঠে ; কিন্তু বেশি লোকের সমাগম হলে শেষে মীরু মন্ডল ও

Dhaka University Institutional Repository

ঝড়ু মাতব্বরের আক্রমণে সেই গানের আসর ভেঙে যায়। করিম সে-সময় থেকে আসর করে গান গায় নি কিন্তু নিজের কুঁড়ের ঘরে বসে আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে আর তালুকদার আহম্মদ সাহেবের বাড়িতে প্রায়ই দিন-মজুরি করে দিন অতিবাহিত করে। করিম নিজের খেয়াল মত চলত বলে কেউ তাকে মাস কিংবা বৎসরের জন্য কাজে রাখত না। সে নিজের স্বাধীন মত সামান্য কিছু উপার্জন করেই সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু আহম্মদ সাহেবের গোমস্তা হাশমৎ খাঁ ছিল চতুর প্রকৃতির লোক। তাই সে চালাকি করে আহম্মদ সাহেবের কাজের মেয়ে গোলাপীর সঙ্গে করিমকে বিয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে প্রতিদিন করিমকে দিয়ে চ্যালা চিরিয়ে নেয়। এভাবে প্রায় একমাস খাটুনির পরও করিম কোন আশানুরূপ ফল দেখতে না পেয়ে তার সামান্য পুঁজির প্রায় সমস্ত টাকা দিয়েই একটি রঙিন শাড়ী কিনে গোলাপীকে গোপনে দিতে গেলে হাশমৎ খাঁর কাছে ধরা পড়ে এবং হাশমৎ খাঁ তাকে সবার সামনে হেনস্তা করে। দরদী কর্তা সাহেবের সহানুভূতিতে করিম সে-যাত্রায় রক্ষা পায়। গোলাপীর প্রতি করিমের ভালবাসার গভীরতা দেখে আহম্মদ সাহেবের মনই শুধু নরম হয় নি; গোলাপীর মনেও করিমের জন্য ভালবাসার জন্ম হয়। তাই যথাসময়ে করিমের বহু সাধের রঙিন শাড়ী দিয়ে বিয়ে হয়।

সামন্ত-পরিবেশে বিস্তৃত এই গল্পটি একজন খেটে খাওয়া মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-বেদনার বিশ্বস্ত রূপায়ণ। সে-কালের গ্রাম-বাংলার বিত্তহীন মানুষের সাধ-আহলাদ ও বিত্ত-বেসাতের চিত্র লেখক দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সহায় সম্বলহীন করিমের ছিল বাপ-দাদার ভিটার উপরে ছোট ঘর, যা গোলাপীকে সে অবলীলায় লিখে দিতে রাজী হয়েছে। অসহায়, সহজ, সরল গ্রাম-বাংলার সে-কালের নিম্ন বিত্ত মানুষ করিমের সামান্য সাধ-আহলাদও পন্ড হয়ে যেত শোষক-শ্রেণীর মাতব্বরদের আক্রমণে। আবার আহম্মদ সাহেবের মত দয়ালু ভূস্বামীদের দয়ায় করিমের মত অসহায় মানুষের মনের বাসনা পূরণ হয়েছে।

সে-সময় সমাজে বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহ উভয়রেই প্রচলন ছিল। আহম্মদ সাহেবের বাড়ীর কাজের মেয়ে গোলাপীর বয়স যখন তের-চৌদ্দ বছর তখন সে বিধবা হয়। বর্তমানে তার বয়স সতের-আঠার। এই গোলাপীর মনে করিমের জন্য ভালবাসার জন্ম হয়। লেখকের ভাষায় ——

Dhaka University Institutional Repository

> মানুষের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের প্রকৃতিই এই যে, ভালবাসার ডাকে তাহারা সাড়া না দিয়াই পারে না সে আহ্বান কোথা হইতে আসিয়াছে সেটুকু বিচার করিবার অবসর অনেক সময়ই তাহাদের জুটে না, -সমস্ত বিচার- তর্ককে উপক্ষো করিয়া তাহারা অতি অকিঞ্চিৎকরের প্রেমকেও বরণ করিয়া লয়। গোলাপীর বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাহাকে পাইবার জন্য করিমের এ সাধ্য-সাধনার কথা শুনিয়া তাহার মনের গোপন ক্রন্দর আনন্দের ঝলকে উজ্জ্বল হইয়া গেল।[২৪]

করিম গোলাপীকে পাবার জন্য এতটাই উদ্‌গ্রীব ছিল যে, এতদিন খেটে যে তিন টাকা কয়েক আনা পয়সা জমিয়ে ছিল, তার তিন টাকা দিয়ে গোলাপীর জন্য শাড়ী কিনে। কিন্তু গোলাপীকে সেই শাড়ী দিতে ব্যর্থ হলে বাড়ি ফিরে বহু যত্নে হাড়ি ভাল করে মুছে, মোটা চাদর দিয়ে শাড়ীটি জড়িয়ে হাড়ির ভিতরে রেখে দেয়। লেখকের ভাষায় ——

> বাড়ী যাইয়া সে তাহার মাচা খুঁজিয়া একটা হাড়ি ও সরা বাহির করিয়া আনিল। হাঁড়িটা খুব ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তাহার মোটা চাদরে শাড়ীখানা জড়াইয়া উহা সেই হাঁড়ির ভিতরে রাখিল ; তারপর হাঁড়ির মুখে সরা চাপাইয়া দিয়া, একখানা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়া উহার মুখ বাঁধিয়া রশি দিয়া চালের মটকায় ঝুলাইয়া রাখিল। [২৫]

অর্থ্যাৎ সে-সময়কার নিম্নবিত্ত মানুষের সংরক্ষণ করার চিত্র ফুটে উঠেছে করিমের সংরক্ষণ করার পদ্ধতির মধ্য দিয়ে।

গোলাপীর চরিত্র চিত্রণে লেখক সে-কালের অসহায়, অবহেলিতা, আশ্রিতা, বাঙালি মুসলমান সমাজের নিচুতলার একটি মেয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। আহম্মদ সাহেব এক মোকদ্দমার তদবিরে যেয়ে গোলাপী ও গোলাপীর বৃদ্ধা মাকে মেহেরপুর থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। প্রায় চার বৎসর যাবত সে আহম্মদ সাহেবের বাড়িতে আছে। আহম্মদ সাহেবের বাড়িতে আসার কিছুদিন পর তার বৃদ্ধা মা মারা যায়। ফলে এই এতিম

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েটির আপনজন বলতে কেউ থাকে না। তাই আহম্মদ সাহেবের বাড়ির সব মেয়েরা তাকে আদর করত। করিমের সঙ্গে বিয়ের প্রশ্নে গোলাপী নীরব থেকেছে। অনেকটা নারী সুলভ লজ্জায় যা অনেকটা লোক লজ্জাও বটে। সমাজ বিবর্তনের ধারায় অনেক কিছু পরিবর্তন হলেও বাঙালি মুসলমান সমাজে গোলাপীর মত নীচুতলার মেয়েদের মত প্রকাশ করার মত পরিবেশ তৈরী হয় নি তখনকার সমাজে। তারা এখনও তেমনটিই রয়ে গেছে।

তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক চর্চারও স্বাধীনতা ছিল না; তার আভাস পাওয়া যায় করিম পাগলার গানের আসরে মীরু মন্ডল ও ঝড়ু মাতব্বরের আক্রমণের মধ্য দিয়ে। গোমস্তা হাশমৎ খাঁদের মত ধূর্ত শোষক শ্রেণীর শিকারে নিঃশেষ হয়েছে গ্রাম-বাংলার সহজ, সরল, অসহায় করিমেরা। কিন্তু আহম্মদ সাহেব হচ্ছেন ব্যতিক্রম। তিনি উদার দয়ালু ভূস্বামী। তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের উদার সমাজদার জমিদার প্রতিনিধি। লেখক এই গল্পে গ্রাম-বাংলার সে-কালের নিম্ন বিত্ত মানুষের সাধ-আহলাদের চিত্র অত্যন্ত যত্ন করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

৫

'মীর-পরিবার' গল্পগ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'হামিদ'। গল্পটি হতাশা ও ব্যথাদীর্ণ এক মাতৃহারা তরুণের অন্তর্যন্ত্রণার কাহিনী। অসুস্থতা ও অবহেলায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে না পারা এক ব্যর্থ যুবকের চিত্র অঙ্কন করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ এই গল্পে। যুবকটির নাম হামিদ। হামিদের ভাইয়েরা সবাই এম.এ, বি.এ. পাশ করে উপযুক্ত হয়েছে, আর সেখানে হামিদ শিক্ষা-দীক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখবোধ করেছে। নানা অসুখের কারণে লেখা-পড়ায় তেমন সুবিধা হলো না দেখে তার পিতা তাকে সংসার দেখতে দিলেন। হামিদ লেখা-পড়া কিংবা সংসারের কাজে কোন জায়গাতেই নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে পারে নি বলে তার পছন্দ অপছন্দের গুরুত্ব কারো কাছে নেই, এমন কি পিতার কাছেও। তার অনিচ্ছাজনিত অক্ষমতাকে ক্ষমা না করে তার পিতা তার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। ফলে তার জীবনে নেমে এসেছে চরম গ্লানি। এই সংসারে যোগ্যতমের সমাদর

Dhaka University Institutional Repository

সবসময়ই আছে, এমনকি পিতার কাছেও। কিন্তু হামিদের মতো অসহায়, অক্ষম নিরীহ সন্তানের প্রতি পিতার অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্যের যন্ত্রণা যে কী ভয়াবহ হতে পারে তারই একটি চমৎকার রূপ ফুটে উঠেছে এই গল্পে, হামিদের দাদি ও হামিদের বাবার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ——

> দাদি ব্যথিত হয়ে বল্লেন, "আহা ষাট, ওকে অমন করে দূর-দূর কর না ; ও যদি কোথাও চলে যায়- তখন ?" পিতা আরো রেগে বল্লেন, "যায় যাবে। ও থেকেও যা, না থেকেও তাই।"[২৬]

কাজী আবদুল ওদুদ এই গল্পের হামিদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে অভিমান ও হতাশায় জর্জরিত একটি বেদনাতুর যুবকের অন্তর্যন্ত্রণার চিত্র অঙ্কন করেছেন। গল্পে হামিদের উক্তির মধ্যে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ——

> যদি লেখাপড়া শিখে নিজের পথ তৈরি করে নিতে পারতুম তবে বোধ হয় পিতার কথায় এত তীব্র জ্বালা অনুভব করতুম না। কিন্তু এখন আমার অন্য সমস্ত দিক বন্ধ হয়ে গিয়ে শুধু যে একটু পথ আছে, তার ভিতর দিয়ে কেবলই ধোঁয়া আস্‌ছে দেখে আমার সমস্ত চিত্ত দম ফেটে মরবার উপক্রম করেছে। [২৭]

হতাশাগ্রস্থ হামিদ সরাসরি স্রষ্টাকে দায়ী করেছে তার জীবনের সমস্ত আনন্দ-সুখ নিভিয়ে অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে দেবার জন্য। তার অভিমানী মনের উক্তি ——

> অনেক বার ভেবেছি, খোদা কেন আমায় এমন করে সৃষ্টি করলেন। শিক্ষা-দীক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে কেন আমার হৃদয়ে তিনি দুঃখবোধের বৃত্তি সজীব রাখলেন। লেখাপড়া বিষয়ে হৃদয় যেরূপ অন্ধকার হয়ে আছে, যদি দুঃখবোধের বৃত্তিও তেমনি হ'ত, তবে কোনো জ্বালাই পোহাতে হত না ; সব

Dhaka University Institutional Repository

> জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে নিশ্চল পাষাণের মতো পড়ে রইতুম। নিষ্ঠুর বিধি আমার সে বন্দোবস্ত করেন নি। আমার জীবনের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে বিভীষিকা উপলব্ধি করবার চক্ষু আমায় দিয়েছেন, আর আমায় যাতনায় ছট্‌ফট্ করতে দেখে নীরবে মজা দেখছেন! ধন্য হে খোদা, তোমায় সবে সুবিচার বলে! তুমি সুবিচার হলে অবিচারক কে? [২৮]

স্রষ্টার প্রতি হামিদের এই অভিমানের মধ্যে তার বিদ্রোহী মনের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের পূর্ববর্তী অন্যান্য ছোটগল্পে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মবোধের ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হলেও হামিদ গল্পটি তার ব্যতিক্রম। এই গল্পেই প্রথম বাঙালি মুসলমান সমাজের একজন প্রতিনিধি হামিদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি মুসলমান সমাজে যে প্রতিবাদ ও সচেতনতার জন্ম হয় লেখক তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন হামিদের এই নেতিবাচক মনোভাবের মধ্য দিয়ে।

সে-সময়কার বাঙালি মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফের পার্থক্য যে পুরোপুরি দূর হয় নি, এমন সংবাদ পাওয়া যায় হামিদের বাবার বংশাভিজাত্যের মধ্য দিয়ে। হামিদের বাবার উক্তি ——

> তুই ত আর কচি খোকাটি ন'স। তোর এ বয়সের ছেলে কি না করছে ? কোনো কাজ ত তোর দ্বারা হ'লই না, এমন কি বংশের সম্মানটুকু যে রাখবি সে জ্ঞানও তোর নেই! সেদিন পর্য্যন্ত শেখদের চৌদ্দ পুরুষ আমাদের জুতো বয়ে এল, আর আজ কিনা তুই তাদের ছেলের সাথে সমানের মতো আলাপ করতে যাস। [২৯]

হামিদের বাবার উক্তির মধ্যে উগ্র আভিজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। আশরাফ শ্রেণীর বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বংশ-মর্যাদাকে কেন্দ্র করে আভিজাত্যের যে অমানবিক বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে মুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয়েছে নিরীহ, অক্ষম হামিদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে। আভিজাত্যের গরিমায় নিরীহ সন্তানও রক্ষা পায় নি। তাই হামিদ এই সব মিথ্যা আভিজাত্যের বেষ্টনি থেকে মুক্তি চেয়ে বিশাল পৃথিবীর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

৬

'মীর-পরিবার' গল্পগ্রন্থের সর্বশেষ গল্প 'আবদুর রহিম'। বাঙালি মুসলমান জমিদার শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সঙ্গে উচ্চ-শিক্ষিতের বুর্জোয়া মূল্যবোধের মিশ্রণে এই গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা উচ্চ-শিক্ষিত যুবক আবদুর রহিম বড় জমিদারের দেওয়ানের পুত্র। দেওয়ান সাহেব তাকে বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন। এম. এ. পড়ান জমিদার সাহেব নিজে। এই জমিদারের একমাত্র কন্যা সালেহাকে আবদুর রহিম বিয়ে করে রুদ্রপুরের কাছারিতে সস্ত্রীক বাস করেন এবং শ্বশুরের ইচ্ছামতো জমিদারি দেখাশুনা করেন। সালেহাকে বিয়ে করে আবদুর রহিম যেমন খুশি হন, তেমনি জমিদার কন্যা সালেহাও কম খুশি হন নি। সমস্ত গল্পেই তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখের আভাস পাওয়া যায়, যাতে দুঃখের কোন লেশ মাত্র নেই।

আবদুর রহিম একটু অন্যরকম মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্যপাশ করা শিক্ষিত আবদুর রহিমের চলাফেরায় চাঞ্চল্য দেখা গেলেও তাঁর স্বভাব-প্রকৃতিতে সেই ছাপ দেখা যায় না। নিজের ব্যাপারে সে উদাসীন কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারে যত্নশীল। অন্দর মহলে যে সব জায়গায় তাঁর স্ত্রী চলাফেরা করেন সে সব জায়গায় ছোট ফুলের গাছ, ফুলের টব দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন স্ত্রীর মন খুশি রাখার জন্য। আবদুর রহিমের এই সৌন্দর্যবোধ কেবল গৃহসজ্জাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। সে তার স্ত্রীর পোশাকের মধ্যেও পরিপাটির ছাপ দেখতে চেয়েছেন। আবদুর রহিম ও সালেহা দুজনেই সৌন্দর্যের পূজারী। তাঁরা এই সৌন্দর্য অনুসন্ধান যেমন মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের মধ্যে করেছেন ; তেমনি করেছেন অন্তরের সৌন্দর্যের মধ্যেও। এমনকি তাঁদের এই সৌন্দর্য প্রেম প্রকৃতির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গল্পে আবদুর রহিমের কথাবার্তায় সব সময় কাব্যময়তা পরিলক্ষিত হয়। গল্পকার আবদুর রহিমের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এভাবে——

> আমি ত আর কিছু জানিনে, আমি শুধু চোখ ভরে দেখি তোমার অতুল রূপ। এ রূপ কত দিন ধরে কত ভাবে দেখে আসছি, তবু এ নূতনত্ব একটুও কমে না। কত রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে চেয়ে' দেখেছি, তোমার ঘুমের সৌন্দর্য্য কত মনোরম ! বড় চক্ষুর উপর কোমল উজ্জ্বল পল্লব একটু টেনে এসে ভ্রমরের মধুপানের মতো কেমন বিভোর হয়ে মিলেছে ! গোলাপী ঠোঁট দু'খানির মাঝে একটা সূক্ষ্ম বিভেদ-রেখা স্পষ্ট হয়ে যেন তাদের অনেক দিনের বাঞ্ছিত মিলন অত্যাসন্ন করে রেখেছে ! এলিয়ে পড়া দেহের উপরে ধবধবে শাড়ী যেন ফুলের পাপড়ির মতো লুটিয়ে রয়েছে। আমি নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে তোমার সে রূপ পান করেছি,— একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেলিনি পাছে সে সৌন্দর্য্যের একটুও টুটে যায়। [৩০]

আবদুর রহিম বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই কেবল প্রকৃত সৌন্দর্য আহরণ করা যায়। আবদুর রহিম এর উক্তি ——

> সালেহা, রূপ কাঁচের আয়নায় ফোটে না, রূপ ফোটে মনের আয়নায়। তাও আবার কবে কোন্ ক্ষণে ফুটে ওঠে তার কিছু ঠিক নেই। [৩১]

আবদুর রহিমের মধ্য দিয়ে লেখক বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি মুসলমানেরা যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মনোযাগী হয়েছে এবং সে সাথে নভেলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। আবদুর রহিম নভেল পড়ে নিজের মনে স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ফলে নয়-দশ বছরের সালেহাকে নিয়ে প্রতিনিয়ত কল্পনা রচনা করেছেন। সালেহা নামের সেই বালিকার মূর্তির সৌন্দর্যের আরাধনা করতে তাঁর ভালো লাগত। আবদুর রহিমের এই সৌন্দর্য আরাধনায় প্রেমবোধ ছিল। সেজন্যই নয়-দশ বছরের বালিকা মূর্তির সঙ্গে তের-চৌদ্দ বৎসরের কিশোরী মূর্তির রূপের

Dhaka University Institutional Repository

যেমন সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন তেমনি সালেহার যৌবনের রূপেও সেই সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। আবদুর রহিম চরিত্রটিতে প্রেমবোধের যেমন প্রকাশ ঘটেছে তেমনি কবি প্রতিভারও প্রকাশ ঘটেছে। আবদুর রহিমের উক্তির মধ্যে তা যথার্থই ধরা পড়ে ——

> বাস্তবিক আমার এত কালের জীবনের কাজ খতিয়ে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায়- অন্য কোনো দিকে মন যায় নি, শুধু তোমার সৌন্দর্য্যে ভোর হয়ে জীবন কেটে গেছে। পান্ডিত্যের কথা মন থেকে সরিয়ে দিয়েছি – দেখলাম, পান্ডিত্য রূপের একটা নগণ্য অংশ। ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলেছি - দেখলাম ঐশ্বর্য্যের শোভা রূপের একটা তুচ্ছ অংশ মাত্র। সব ছেড়ে তোমার রূপের মহিমা চোখ ভরে দেখ্‌ছি। এ যে কি জিনিষ, সালেহা, তা শুধু সমস্ত প্রাণ দিয়ে অনুভব করা যায় ! তোমায় কথায় কেমন করে বুঝিয়ে বলব বল! [৩২]

আবদুর রহিম তার স্ত্রীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রাণ ভরে ভালোবেসেছেন। লেখক এই গল্পে আবদুর রহিমের সৌন্দর্য-পিপাসু মনের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

সালেহার পিতা বড় মনের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি শ্রেণী বৈষম্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। সেজন্যই তাঁর একমাত্র কন্যা সালেহাকে দেওয়ানজীর ছেলের সাথে বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে কুণ্ঠিত হন নি। বরং সালেহাকে আদর্শ স্ত্রী হবার শিক্ষা দিয়েছেন। আর দশজন সাধারণ ভদ্র মেয়ের মত সাধারণ জীবন-যাপনের তালিম দিয়েছেন। সালেহাকে লেখা-পড়া, নামাজ-রোজা ও অন্যান্য আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে শান্ত-শিষ্ট ও নিরহঙ্কার হতেও উপদেশ দিতেন। সালেহা বাবার উপদেশ মত নিজেকে সাধারণ আর দশজনের সাথে মিলাতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু শ্রেণী বৈষম্য যে এত সহজেই ঘুচে না ; তা সালেহার উক্তির মধ্যেই স্পষ্ট প্রকাশ পায় ——

Dhaka University Institutional Repository

> আমি আমার সাধ্যমতো তাঁর উপদেশ পালন করতাম। তবু দেখতাম, আমাদের পাড়ার ভদ্রঘরের রায়তের মেয়েদের সাথে সব বিভেদ ভুলে গিয়ে মিশ্‌তে চেষ্টা করলেও ঠিক সেটি হয়ে উঠ্‌ত না। কেন হ'ত না, সে কথা আমি অনেক বার ভেবে দেখেছি– তাদের সাথে আমি খুব আপনার মতো মিশতে গিয়েও এমন কোনো ব্যবহার বা রুচির পরিচয় দিয়েছি যাতে করে স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যেত যে, আমি তাদের ঠিক এক শ্রেণীর লোক নই। [৩৩]

এই শ্রেণী বৈষম্য সালেহাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। তাই বিয়ের রাতেই আবদুর রহিমকে পা ছুঁয়ে সালাম করেছেন। এর মধ্য দিয়ে সালেহা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সে বড় লোকের মেয়ে হলেও তার কাছে স্বামীর মূল্য অনেক।

এই গল্পে সালেহার পিতা জমিদার সাহেবের বড় মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একজন উদার মনভাবাপন্ন জমিদার। এত বড় জমিদার হওয়ার পরও তাঁর একমাত্র কন্যাকে আর দশজন ভদ্র ঘরের মেয়ের মত সাধারণ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর এই উদারতার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান জমিদার শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

আবদুর রহিমের মধ্য দিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ বিশ শতকের গোড়ার দিকের উচ্চ-শিক্ষিত উঠতি বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এরা আধা-সামন্ত যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণী– যাদের সামন্তবাদ বিরোধী কোন চরিত্র ছিল না। পরশ্রমজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি আবদুর রহিম বিবাহ-সূত্রে লাভ করেন সম্পত্তির অধিকার, সে সাথে আভিজাত্য। অন্যদিকে উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণের ফলে তাঁর ভেতরে সৃষ্টি হয়েছে বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যা– সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে খুব একটা দূরে নয়। মূলত আবদুর রহিমের চরিত্রের মধ্যদিয়ে লেখক মেরুদন্ডহীন ঘর-জামাইয়ের চরিত্র চিত্র অঙ্কন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এই গল্পে নারী-শিক্ষার অগ্রগতির কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। আবদুর রহিম এম.এ পাশ, স্ত্রীর স্বাধীনতায় সম্পূর্ন বিশ্বাসী তবুও স্ত্রীকে শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে নিতে তার কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। এমন কি সালেহার বাবা সালেহাকে লেখা-পড়া, নামাজ-রোজা, আচার-আচরণ বা অন্যান্য কাজে উৎসাহিত করলেও প্রাতিষ্ঠানিক বিচারে তার কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব, বাঙালি মুসলমান সমাজে নারী-শিক্ষার অনগ্রসরতার ছাপ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এই গল্পে।

'মীর-পরিবার' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সে-সময় বাঙালি মুসলমান সমাজ প্রধানত ভূমি-নির্ভর ছিল। পরবর্তীতে তারা এই ভূমি-নির্ভরতা কাটিয়ে চাকুরির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ এ-সময় বাঙালি মুসলমান সমাজ উত্তরণের পথে পা বাড়িয়েছে বলা যায়। সে সাথে ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও আগ্রহবোধ করেছে এবং তাতে তারা যথেষ্ট অগ্রসরও হয়েছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালি মুসলমান সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই কেবল ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হতে দেখা যায় কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে তা গ্রাম-বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজে ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হতে থাকে। চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্যে এরা সামন্তযুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য থেকে খুব একটা দূরে নয় কিন্তু এরাই হচ্ছে বাঙালি মুসমানের পরবর্তীকালের শক্তিমান আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পূর্বসুরী। কাজী আবদুল ওদুদের 'মীর-পরিবার' গল্পগ্রন্থে এই চরিত্রগুলো সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সার্থকতারও পরিচয় দিয়েছেন। আর সে জন্যই বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রথম রূপকার হিসেবে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তাঁর একটি বিশেষ স্থান আছে।

তরুণ

কাজী আবদুল ওদুদের অপর গল্পপ্রয়াস 'তরুণ' (১৩৫৫) গ্রন্থের তিনটি গল্প 'তরুণ' 'মা' এবং 'ভুল'।[৩৪] মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ১৩২৫ বৈশাখ ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় 'ভুল' গল্পটি এবং ১৩২৬ কার্তিক সংখ্যায় 'মা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। 'তরুণ' গল্পটির রচনাকাল ১৩৩১ ; ঢাকা থেকে প্রকাশিত আবুল হুসেনের তরুণ-পত্রে ১৩৩২ বৈশাখ সংখ্যায় এটি ছাপা হয়।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

'তরুণ' (১৩৫৫) গ্রন্থের গল্পগুলো 'মীর-পরিবার' (১৯১৮) গল্পগ্রন্থের কাছাকাছি সময়ের রচনা। কিন্তু উৎকর্ষ বিচারে এগুলো 'মীর-পরিবার'কে অতিক্রম করেছে – এমন কথা বলা যায় না।[৩৬] এই গল্পগুলোর অভিনবত্ব হচ্ছে এগুলো গতানুগতিক প্রেম-বিষয়ক নয়। এগুলোর একটির অবলম্বন তারুণ্য এবং অপর দুটো প্রধানত বাৎসল্যরসের গল্প।

২

'তরুণ' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'তরুণ'। লেখক এই গল্পে তারুণ্যের ধর্ম প্রকাশ করেছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন যে, তারুণ্যের কোন মৃত্যু নেই। গল্পের নায়ক নরেন তরুণ বয়সের এক খেলোয়াড় এবং এই খেলার জন্যই বন্ধুমহলে তার অসাধারণ জনপ্রিয়তা। এই প্রতিভাবান খেলোয়াড় একদিনের এক ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতার এক বয়স্ক খেলোয়াড়ের প্রতিহিংসার শিকার হয়। ফলে মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়ে কয়েক দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এতে তার বন্ধুরা অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু তারা নরেনের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি ভুলতে পারে নি। তাই বছর চারেক পরে সেই মাঠেই এক ফুটবল ম্যাচে অন্য এক কৃতী তরুণ খেলোয়াড়কে দেখে নরেনের এক বন্ধু সাজ্জাদ বলে ওঠে ——

> আর যেখানেই দেখি নতুন বয়স, আর কোনো খেলোয়াড়ের আপ্রাণ—চেষ্টা আর চোখে মুখে চমৎকার স্ফুর্তি—সেখানেই আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে নরেন — সেই উল্লাসময় অম্লান নরেন।[৩৭]

লেখক এই গল্পে যে-সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন, সে-সমাজে হিন্দু-মুসলমানের কোন ভেদাভেদ ছিল না। তারা সবাই তরুণ এটাই তাদের একমাত্র পরিচয়। গল্পটিতে নরেন, সাজ্জাদ, ক্ষিতীশ, নিধুবাবু, বিষ্ণুপদ ইত্যাদি নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ধর্ম ভেদে এদের কোন তারতম্য ঘটে নি। তাই নরেনের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে "ঘোর ডিলিরিয়াম" অবস্থায় নরেন চিৎকার করে বলে ওঠে ——

Dhaka University Institutional Repository

> ওরে ক্ষিতীশ, সাজ্জাদ, এগিয়ে খেল এগিয়ে খেল্ ..... নিধুর নাম ভুলে যা .... বুড়ো হয়ে গেছে ..... আমাকে ও ঘুষি মেরেচে,— ও খেলোয়াড় নয় খেলোয়াড় নয়।[৩৮]

লেখক এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, যারা অন্যের ভালো দেখতে পারে না এবং মানবিক মূল্যবোধ-শূন্য তাদের কাছে জাতকুল সম্প্রদায় কিছুই নেই, তারা সমগ্র মানবজাতিরই শত্রু। আর এ জন্যই নিধু বাবু নামক এই বয়স্ক খেলোয়াড় তার স্ব-সম্প্রদায়েরই খেলোয়াড় নরেনকে আঘাত করতে পেরেছিল।

এই গল্পটিতে কাজী আবদুল ওদুদ ছোট শহরে বাস করা ছেলেদের তারুণ্যের প্রকাশ করেছেন। ছোট শহরে বস-বাস করায় এই সব খেলোয়াড়রা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেশার সুযোগ পেয়েছে। তাই জেলা শহরের দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলার সংবাদ তাদের মধ্যে ভয়ের উদ্রেক করে। লেখক তাদের ভয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ——

> আষাঢ়ের গুরু গুরু মেঘ—গর্জ্জনের নীচে মাটির গাছপালার নদনদীর প্রতীক্ষায় যে উল্লাস আবেগ সংশয়, তার চাইতেও নিবিড়তর তাদের এই প্রতীক্ষা।[৩৯]

নরেন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে প্রকৃতির স্বাদ গ্রহণ করেছে বলেই সে চঞ্চল। লাফাতে, দৌড়াতে, সাঁতার কাটতে তার জুড়ি নেই। আর সবাই জানে, এই বয়সেই নরেন ক্রিকেটে, ফুটবলে ওস্তাদ খেলোয়াড়। এভাবে গল্পের নায়ক নরেন হয়ে ওঠে তারুণ্যের প্রতীক। এই তারুণ্যের মৃত্যু নেই, যুগে যুগে নবীনের উদ্দীপনার মাঝেই এই তারুণ্য বেচেঁ থাকে।

৩

'তরুণ' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'মা'। গল্পটিতে পুত্রহারা এক বৃদ্ধা মায়ের শোকার্ত হৃদয়ের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বৃদ্ধার মহিম নামে একটি ছেলে ছিল যে এক বছর আগে মারা যায়, ফলে তারই স্মৃতিচারণ

Dhaka University Institutional Repository

করে বৃদ্ধার দিন কাটতে থাকে। এর মধ্যে এই বৃদ্ধা সন্ধান পান নবীন লেখকের যে- কিনা দেখতে তাঁরই মৃত ছেলে মহিমের মত। এই নবীন লেখকের মাঝেই সে তাঁর হারানো ছেলের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়, আর বৃদ্ধা ভিখারিণীর মাতৃস্নেহ নবীন লেখককেও কাছে টানে। নবীন লেখক যেমন শ্রেণী বৈষম্যের বিভেদ ভুলে গিয়ে বৃদ্ধা ভিখারিণীর মাতৃস্নেহের পূর্ণ স্বাদ পেয়েছেন তেমনি নবীন লেখকের মধ্য দিয়েও বৃদ্ধা তাঁর সন্তান হারানোর শূন্যতাকে পূরণ করতে চেয়েছেন।

কাজী আবদুল ওদুদ এই গল্পে শাশ্বত একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অবহেলিত, নিম্নবিত্ত সর্বহারা বাঙালি জীবনের কিছু বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। একটা উদার শুভবোধ ছিল কাজী আবদুল ওদুদের। জীবনের প্রথম থেকেই তিনি তাঁর কাছে যা ধ্রুবসত্য হৃদয়ে তা ধারণ করেছেন এবং সেই সত্যকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে সত্য হচ্ছে বিরোধ নয়, মানুষের সঙ্গে চাই মানুষের মিলন। আর এজন্য প্রয়োজন একটা উদার মানবিকপূর্ণ হৃদয়।[৪০] এই উদারতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দরিদ্রা ভিখারিণীর সঙ্গে নবীন লেখকের সুন্দর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

গল্পে কাজী আবদুল ওদুদ গ্রাম-বাংলার নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন-যাপনের চিত্র অঙ্কন করেছেন, দরিদ্রা ভিখারিণীর বাড়ির বর্ণনার মধ্য দিয়ে। শহর থেকে দু'মাইলের কাছাকাছি দূরত্বে বৃদ্ধার বাড়ি। বাড়ির চারপাশে পচা পুকুর, কচুর গাছ তাতে যথেষ্ট জন্মেছে। সেখানকার চারদিকের গাছপালা ও মাটির রং বিশ্রী রকমের। পাড়াগাঁয়ের প্রকৃতিতে যে একটা শ্যামল চাকচিক্য দেখতে পাওয়া যায়, শহরের ধোঁয়া ও আর্বজনা সেখানকার সে স্বাভাবিক চেহারাকে পাল্টিয়ে বিশ্রী করে দিয়েছে। লেখক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের ঘর-বাড়ি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের যেমন বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি তাদের আতিথেয়তারও পরিচয় দিয়েছেন নবীন লেখকের প্রতি বৃদ্ধার আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে। লেখক বৃদ্ধাকে দেখতে তাঁর বাড়িতে গেলে বৃদ্ধা এক টুকরো তক্তা নিয়ে লেখকের সামনে বসেন, তাঁকে বসতে দেন একটি পিড়ি এবং তাঁকে কী খেতে দিবেন তা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। বৃদ্ধা তাঁর হেঁসেলে ঢুকে কাঠা ধরে কুল এনে লেখকের সামনে রেখে দেন; তা যদি তাঁর খেতে ইচ্ছে না হয় তাহলে নিজ হাতে গাছ থেকে টাটকা কুল পেড়ে খেতে বলেন। এখানে অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন-যাপনের চিত্র কাজী আবদুল ওদুদ তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম বাংলার দূরন্ত ছেলেদের অত্যাচারের চিত্র নতুন কিছু না যা এই গল্পে ফুটে উঠেছে বৃদ্ধার বাড়ীতে দুষ্ট ছেলেদের অত্যাচারের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা এসে বৃদ্ধার বাড়ীর গাছগুলো তছনছ করে ফেলে। বাড়ী থেকে বৃদ্ধা বের হলেই ফিরে এসে দেখেন গাছের তলাটা সব ফল, পাতা, কচি ডাল দিয়ে একেবারে হাঁটু সমান জঙ্গল হয়ে আছে; যা দেখে বৃদ্ধার কষ্ট হয়। কারণ এই গাছগুলো তাঁর মৃত ছেলের লাগানো। বৃদ্ধার ভাষায় ——

> তাই আমি ওদের বলে দিয়েছি, 'তোরা গাছগুলো নষ্ট করিস নে; যখন খেতে ইচ্ছে যায় তখন গিয়ে ফল পেড়ে খাস, আমি কিছু বল্‌ব না ।[৪১]

দূরন্ত ছেলেদের প্রতি বৃদ্ধার যেমন বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে তেমনি আবার সহানুভূতিও প্রকাশ পেয়েছে; যা বাঙালি নারীর বৈশিষ্ট্য। সমাজে এক সাথে বস-বাস করলে একে অন্যের সাথে একাত্ম হয়ে থাকে তা অন্ত্যজ শ্রেণী হলেও ব্যতিক্রম হয় না; তার প্রমাণ মেলে এই গল্পে বৃদ্ধার উক্তির মধ্য দিয়ে——

> ঐ বাড়ীর বৌ বড় লক্ষ্মী মেয়ে, সে এসে আমার রান্নাটা করে দিয়ে যায় ।[৪২]

বাঙালি সমাজে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অকৃত্রিম ভালোবাসার চিত্র যেমন চিরন্তন তেমনি বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের প্রচলনও দীর্ঘদিনের বাঙালি সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য। বৃদ্ধার উক্তির মধ্য দিয়ে যা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ——

> আহা, আমার তিন বছরের মহিমকে কত দুক্ষু কষ্ট করে বড়টি করে তুললাম। মহিম বল্‌লে, 'আমি ত এখন গতর খাটাতে শিখেছি, মা, আর ত তোমাকে আমি কষ্ট করতে দেব না ; তুমি ঘরে বসে থাক, এখন আমিই তোমাকে খাওয়াতে পরাতে পারব ।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি সমাজে পিতা-মাতা সন্তানদের ছোটবেলায় লালন-পালন করে পরবর্তীতে সন্তান বড় হলে তারাই বৃদ্ধ পিতা-মাতার দেখাশুনার দায়িত্ব নেয়। লেখক তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই গল্পের বৃদ্ধা ও তাঁর ছেলে মহিমের কথার মধ্য দিয়ে।

লেখা-পড়ার গুরুত্ব সে-সময়কার সমাজে ছিল যার প্রমাণ নবীন লেখক; কারণ লেখক বাড়ী ছেড়ে শহরে এসে বাস করেছেন লেখা-পড়ার জন্যই। এই লেখা-পড়াই নবীন লেখককে উদার মানসিকতার অধিকারী করেছে। ফলে তিনি শ্রেণী বৈষম্যকে অতিক্রম করে ভিখারিণীর মাতৃস্নেহকে অকপটে গ্রহণ করেছেন।

গল্পের বৃদ্ধার মধ্য দিয়ে লেখক সহজ সরল এক মাতৃহৃদয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন - যার আছে অফুরন্ত মাতৃস্নেহ ও ভালোবাসা; তাই কন্‌ভোকেশনের দিনে Gown, Hood পরিহিত নবীন লেখককে চিনতে তার কষ্ট হয় ; সে সাথে জমকালো পোশাক বৃদ্ধা ও নবীন লেখকের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। নবীন লেখক উপলব্ধি করতে পারেন যে, লাট সাহেবের হাতের ডিগ্রির সনদের চেয়ে বৃদ্ধার স্নেহের মূল্য অনেক বেশী। লেখকের ভাষায় ——

> তার কৃশ কম্পিত মলিন হাতের কল্যাণ-স্পর্শে আর লাট- সাহেবের হাতের ডিগ্রির সনদে যে কত তফাৎ তা আমি আজ প্রাণ ভরে উপলব্ধি করলাম।[৪৪]

এই গল্পের নায়ক নবীন লেখক সদ্য ডিগ্রি প্রাপ্ত বাঙালি মুসলমান তরুণ। সে হিসেবে বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তাধারার ধারক। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর এই গল্পে শ্রেণী বৈষম্যকে অতিক্রম করে মাতৃস্নেহকে উচ্চ স্থান দিয়েছেন, তাতে তাঁর উদার মানসিকতাই প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া তিনি এই গল্পে গ্রাম-বাংলার যে সহজ সরল নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন ; সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও গ্রাম-বাংলার এই নিম্নবিত্ত সমাজের ছবি এখনও তেমনই রয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪

কাজী আবদুল ওদুদের 'ভুল' (১৩২৫) গল্পটি স্নেহময়ী দাদি ও তার নাতি বালক শদু ওরফে শহীদউদ্দীনের অসুস্থ অবস্থার একটি করুণ চিত্রকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পিতৃ-মাতৃহীন শদু দাদির আদর-যত্নেই লালিত-পালিত হয়েছে। শদুর কয়েক দিনের প্রচন্ড জ্বর, যা বাড়ির সবাইকে বিচলিত করে। এই অবস্থায় ডাক্তার তাকে দুধ-খৈ পথ্য দেয় কিন্তু বার বার একই খাবার খেতে তার ভাল লাগে না। শদুর খেতে ইচ্ছে হয়েছিল ইলিশ মাছ দিয়ে সরু চালের ভাত; আর তা খাবার জন্য সে দাদির কাছে বায়না ধরে ; ফলে দাদির স্নেহের টানের কাছে ডাক্তারের নিষেধ টিকে নি। ইলিশ মাছ খেয়ে শদুর ছেড়ে আসা জ্বর দ্বিগুণ মাত্রায় আসে। এই অবস্থায় দাদির অন্তর্যন্ত্রণার শেষ নেই। পরে মহকুমার এ্যাসিস্ট্যন্ট সার্জনের চিকিৎসায় শদু চোখ মেলে তাকালে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দাদি প্রাণের যন্ত্রণা মোচন করে। গল্পটিতে দাদি-নাতির আন্তরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গ্রাম-বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের চিরন্তন চিত্র ফুটে উঠেছে ; যা লেখক অত্যন্ত যত্ন করে অঙ্কন করেছেন।

গল্পে শদু তার দাদিকে সব সময়ই 'তুই' বলে সম্বোধন করেছে। এতে তাদের সম্পর্কের গভীরতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। বাঙালি মুসলমান একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র লেখক অত্যন্ত যত্ন করে অঙ্কন করেছেন এই গল্পে। এ পরিবারে থাকে শদুর দাদি, চাচা-চাচি ও চাচাতো ভাই। শদুর দাদি তার সংসারের পরিপূর্ণ দায়িত্ব পুত্রবধূর হাতে ন্যাস্ত করেছে নিঃশ্চিন্ত মনে। এই গল্পে বৌ-শাশুড়ির মধ্যেও অত্যন্ত মধুর সম্পর্কের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। লেখকের ভাষায় ——

> শাশুড়ী সমস্ত গৃহস্থালীর ভার তাঁর বধূর হাতেই দিয়া- ছিল। বধূ রেকাবিতে ভাত বাড়িলেন এবং একখানি ইলিস মাছের পেটী শাশুড়ীর পাতে দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার মাথা খান, মাছখানা আজ আপনাকে খেতেই হবে।"[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

শদুর দাদি মাছ খেতে চায় নি কারণ তার অসুস্থ শদুর কথা মনে পড়েছিল; কিন্তু পুত্রবধূর দিব্যির জন্য তাকে সামান্য মুখে দিতে হয়েছিল। এই গল্পে গ্রাম-বাংলার সহজ, সরল নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের মায়া-মমতা ঘেরা অকৃত্রিম বন্ধনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই গল্পে অসুস্থ শদুকে তার চাচি সস্নেহে হাত বুলিয়ে কুপথ্য খেতে নিষেধ করেছে। শদুর দাদি, শদুর আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছে, সেই সাথে কুড়ি রাকাত নামাজ আর দশটা রোজার রাখার নিয়ত করেছে। গল্পে ধর্মবিশ্বাসের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠলেও অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসের কোন প্রকাশ নেই। তাই তারা শদুকে ঝাড় ফুঁকের জন্য বসিয়ে না রেখে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

'ভুল' গল্পটিতে তৎকালীন বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের পারিবারিক বন্ধনের সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। এই গল্পে গল্পকারের অন্তরের কামনা প্রকাশ করেছেন শদুর চাচার ডাক্তারী চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। কারণ কাজী আবদুল ওদুদ চেয়েছেন, বাঙালি মুসলমান সমাজ বিজ্ঞান-মনস্ক ও যুক্তিনিষ্ঠ হোক ; তারই ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে গল্পটিতে।

৫

'তরুণ' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে তারুণ্য, ঈর্ষা, মাতৃস্নেহ, নাতির প্রতি দাদির অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা। এই গল্পগুলোর একটির অবলম্বন তারুণ্য হলেও অপর দু'টিতে প্রধান্য পেয়েছে বাৎসল্যরস।

'তরুণ' গল্পের নায়ক নরেন এক ফুটবল প্রতিযোগিতায় এক বয়স্ক-খেলোয়াড়ের প্রতিহিংসার শিকার হয়। ফলে গুরুতর আহত অবস্থায় কয়েক দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নরেনের মৃত্যু হলেও সে হয়ে ওঠে তারুণ্যের প্রতীক। এই তারুণ্যের মৃত্যু নেই, যুগে যুগে নবীনের উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার মধ্যে বেঁচে থাকে। এই গল্পে হিন্দু-মুসলমানের মিত্রতার সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। 'মা' গল্পে, পুত্রহারা

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধা ভিখারিণীর মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহের চিত্র অত্যন্ত যত্ন করে এঁকেছেন কাজী আবদুল ওদুদ। 'মা' গল্পের এই বৃদ্ধা ভিখারিণীও হিন্দু রমণী। তাঁর এই দুটো গল্পেই সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতিপূর্ণ বাঙালি সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে, তাঁর পরিবর্তিত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। এ-সময় কাজী আবদুল ওদুদ মানবতাবাদকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। 'ভুল' গল্পটিতে লেখক তৎকালীন গ্রাম-বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের চিত্র অঙ্কন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, যেখানে নাতির প্রতি দাদির অসীম ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া এই গল্পে পারিবারিক বন্ধনেরও সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার; তাই গল্পে দাদি-নাতির, বউ-শাশুড়ি, মা-ছেলের পারিবারিক সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। পরিশেষে বলা যায় যে, কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'তরুণ' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে তৎকালীন বাঙালি সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণীর সামগ্রিক জীবন-যাপনের চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। নুরুল আমিন, কাজী আবদুল ওদুদ-রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড), ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪৯৭।
২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৭।
৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- (৪৯৭-৪৯৮)।
৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৮।
৫। খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৩১২।
৬। নুরুল আমিন, কাজী আবদুল ওদুদ-রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড), ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ১৩।
৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫।
৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬।
৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০।
১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০।
১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪।
১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮।
১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫।
১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫।
১৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯।
১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২।
১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২।
১৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪।
১৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬।
২০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮।
২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১।
২২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫২।
২৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০।
২৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯।
২৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৫।
২৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৫।
২৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৩।
২৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

২৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৫।
৩০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।
৩১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।
৩২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৬।
৩৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮১।
৩৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭।
৩৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০১।
৩৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭।
৩৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭৫।
৩৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭৪।
৩৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭০।
৪০। সাঈদ-উর রহমান, ওদুদ-চর্চা, ১৯৮২, একাডেমীক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ২০২।
৪১। নুরুল আমিন সংকলিত ও সম্পাদিত, কাজী আবদুল ওদুদ-রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড), ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ২৮২।
৪২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৩।
৪৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭৮।
৪৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৬।
৪৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ উপন্যাস

নদীবক্ষে

১৯১৯ সালে 'নদীবক্ষে' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।[১]

কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম উপন্যাস 'নদীবক্ষে' (১৯১৯)তাঁর ছাত্র-জীবনের রচনা। অপর উপন্যাস 'আজাদ (১৯৪৮) রচিত হয়েছে ১৯৩০ এর দিকে। বাঙালি মুসলমান সমাজকে অবলম্বন করে উপন্যাস দুটো গড়ে উঠেছে। 'নদীবক্ষে' বাঙালি মুসলমান কৃষক-জীবনের কাহিনী আর 'আজাদ' শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজের জীবন–চিত্রের রূপায়ণ।[২]

'নদীবক্ষে' উপন্যাস পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখের এক চিঠিতে শান্তিনিকেতন থেকে ওদুদকে লেখেন ——

> আপনার লিখিত 'নদীবক্ষে' উপন্যাস খানিতে মুসলমান চাষীগৃহস্থের যে সরল জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকদের কাছে খুলিয়া দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকত্ব, সরসতা ও নূতনত্বে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি– এই কারণে আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন।[৩]

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নজরুল সেনাবাহিনী থেকে কলকাতায় ফিরে এলে কাজী আবদুল ওদুদ তাঁকে 'নদীবক্ষে' পড়তে দেন। উপন্যাসটি পড়ার পর "দিলখোলা আবেগচঞ্চল নজরুল প্রশংসায় ভেঙে পড়েন ; উপন্যাসখানি তার ভাল লেগেছিল।"[৪]

'নদীবক্ষে' প্রকাশের পরপর ১৩২৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যা মাসিক সওগাতে সৈয়দ এমদাদ আলী লিখেছিলেন ——

Dhaka University Institutional Repository

..... লেখক তরুণ যুবক কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে কৃষক জীবনের শত খুঁটিনাটী বিষয়, তাহাদের সুখ-দুঃখ ,হর্ষ-বিষাদ, মান-অপমানের কথা এই বহিতে বলিয়াছেন, তাহাতে তাহার সূক্ষ দৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ..... কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের রচনারীতি আশাজনক । তাঁহাকে এ-বিষয়ে রবীন্দ্রপন্থী বলা যাইতে পারে। উপন্যাস রচনায় তিনি কালে সিদ্ধহস্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। আমরা তাঁহার 'নদীবক্ষে' পড়িয়া তুষ্ট হইয়াছি।[৫]

মুহম্মদ আবদুল হাই 'নদীবক্ষে' র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৫৮ বলে উল্লেখ করেন। এবং উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ——

'নদীবক্ষে' বিখ্যাত প্রবন্ধকার এবং চিন্তাশীল লেখক জনাব কাজী আবদুল ওদুদের লেখা। চিন্তা ও মননধর্মী রচনার সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী রচনার পাথর্ক্য রয়েছে। ওদুদ সাহেবের চিন্তাধর্মী রচনার সঙ্গে বহু পাঠকই পরিচিত বলে তাঁর এ-উপন্যাস পড়বার লোভ সংবরণ করা পাঠক মাত্রেরই দুরূহ। ..... ওদুদ সাহেবের তরুণ বয়সের এ উপন্যাসটিতে বাস্তব ও কল্পনার অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে। এ—উপন্যাস ঘটনা-প্রধান ততটা নয় যতটা বর্ণনাপ্রধান। এ বর্ণনা সবটুকুই নায়ক লালুর অন্তর-জীবনের ঘাত-সংঘাতকে কেন্দ্র করে লেখকের অন্তর্দৃষ্টিজাত। নায়কের মনোযাতনা উদ্‌ঘাটনের স্বাভাবিকত্ব, অবস্থার বিপাকে মতির প্রতি তার সংযম, শালীনতা ও শুচিতাবোধ পাঠকের মনকে স্পর্শ করে। ..... আযাদী লাভের পূর্বে বাংলায় মুসলমানেরা যে-কটি উপন্যাস রচনা করেছেন আমার তো মনে হয় তার মধ্যে 'নদীবক্ষে'ই একমাত্র সার্থকতম উপন্যাস।[৬]

উপরি-উক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ওদুদ তাঁর প্রথম উপন্যাসেই সম্ভাবনার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধ ও সমালোচনায় অধিকতর অনুরাগী হওয়ায় সাহিত্যের এ-শাখায় তাঁর প্রয়াস নিয়োজিত হয় নি। ফলে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'আজাদ' অসমাপ্তই থেকে গেছে।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

২

'নদীবক্ষে' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের চরঅঞ্চলের কৃষক-জীবনের বাস্তব কাহিনী বিধৃত হয়েছে গোপাল গাঁ ও ইলিশমারি চরের সমাজ-জীবনকে ভিত্তি করে। উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক বর্ষাকালে গোপাল গাঁয়ের জমির শেখের বাড়ির সামনের ডোবার বর্ণনা দিয়েছেন ——

> বর্ষার সময়ে এই ডোবা জলে ভরিয়া যায় এবং ইহার ভিতরে পূর্ব হইতে ডালপালা ফেলিয়া রাখা হয় বলিয়া বর্ষার শেষে পানি টানিয়া গেলে ইহাতে প্রচুর মাছ থাকে। জমির ও তাহার নিকটস্থ দুই-এক ঘর প্রতিবেশীর এই মাছেই বৎসরের প্রায় অর্ধেক কাটিয়া যায়।[৮]

ঔপন্যাসিকের এই বর্ণনার মধ্যে কৃষক-পরিবারের জীবন-যাপনের সুন্দর পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের লালু, মতি, ফটিক, দুখে, জাফর শেখ, জমির শেখ, লালুর মা, মতির মা, দুখের মা ইত্যাদি চরিত্রের মধ্য দিয়ে কৃষক সমাজ-জীবনের কাহিনী অগ্রসর হয়েছে।

লালুর বাবা জাফর শেখ আর মতির বাবা জমির শেখ চাচাতো ভাই। তারা জমিদারদের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে ঘর-বাড়ি ছেড়ে গোপাল গাঁয়ে এসে ঘর বেঁধে স্থায়ীভাবে বস-বাস করতে থাকে। তাদের দুই ভাইয়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তাই জাফর শেখের মৃত্যুর পর জমির শেখ লালুদের জমিগুলো দেখাশুনা করেছে। তাতে বছর না চললে জমির শেখ নিজের অংশ থেকে ফসল দিয়ে লালুদের সংসার চালিয়েছে, কারণ লালুর বাবার মৃত্যুর সময় মতির বাবার উপর লালুদের দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে যায়। সে সাথে আরেকটি কথা রাখতে বলে, তা হলো লালুর সাথে মতির বিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি।

এই উপন্যাসের লালু মতির চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড়। বাল্য-কাল থেকেই সে মতিকে ভালবেসেছে কিন্তু এই ভালবাসা ছিল একটু অন্যরকম। যেখানে স্নেহ আছে, মায়া আছে, বন্ধুত্ব আছে। তাই লালু মাছ ধরতে গেলে মতিকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। ঝড়ের দিনে আম কুঁড়াতে গেলেও তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। দূরের বিল থেকে মতির জন্য পদ্ম চাকা, ট্যাপ, পদ্মফুল, পদ্মের ডাঁটা ইত্যাদি এনে দিয়েছে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ভালোবাসায় ভিন্নরকম অনুভূতির জন্ম দেয়; তা হলো মতিকে আপন করে পাবার ইচ্ছা।

Dhaka University Institutional Repository

সময় পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে লালুরও বয়সের পরিবর্তন ঘটে। এই সময় লালু সব কিছুতেই অন্যরকম পুলক অনুভব করে। তার যেন অবসর নেই। সব কাজের মধ্যেই উদ্দামতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই লালু অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ উন্নতি করতে সক্ষম হয়। এসব কিছুর পিছনে উৎসাহ হিসেবে কাজ করেছে মতিকে নিজের করে পাবার স্বপ্ন। এসব কল্পনার মধ্য দিয়ে লালু যখন দিন কাটাতে থাকে, ঠিক সে-সময়েই হঠাৎ বর্ষা এসে লালুর এত দিনের কষ্টে গড়া সাজানো সংসার তছনছ করে দেয়। তার হালের দুটো গরু রোগে মারা যায় আর ক্ষেতের ধান বর্ষার পানিতে ডুবে যায়। এতে লালু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নানা চিন্তা-ভাবনার পর লালু কোন পথ দেখতে না পেয়ে নিজের অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য বাদামুল্লুকে ধান কাটতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। বাদামুল্লুকে ধান কাটতে যাওয়া এই অঞ্চলের কৃষক-পরিবারের কাছে নতুন কিছু নয়। কারণ অনেক আগে মতির বাবা ও লালুর বাবা বাদামুল্লুকে ধান কাটতে গিয়েছিল। লালুর ইচ্ছা ছিল বাদামুল্লুকে গিয়ে কিছু ধান জোগাড় করে নিয়ে আসতে পারলে আর কিছু ধার-দেনা করে গরু কিনে শক্ত হাতে হাল ধরতে পারলে পরে কোন অভাব থাকবে না।

চাষী-পরিবারের ছেলে-মেয়ে লালু ও মতি। তারা দুজন দুজনকে ভালোবেসেছে কিন্তু কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারে নি। তাদের এই ভালোবাসার গভীরতা তাদের অভিভাবকরাও আন্দাজ করতে পারে নি। তাই লালু বাদামুল্লুকে গেলে মতির বাবা-মা ইলিশমারি চরের এরফান মন্ডলের ছোট ছেলে ফটিকের সঙ্গে মতির বিয়ে দেয়। মতি তার মনের কথা বাবা-মা'কে জানাতে পারে নি। কারণ সে-সময়কার সমাজে মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের কথা বলার মত পরিবেশ তৈরি হয় নি। ফলে বাধ্য হয়েই ফটিকের ঘরে যেতে হয়েছে মতিকে। মতি ফটিকের ঘরে যেয়েও লালুকে ভুলে থাকতে পারে নি। অন্যদিকে লালুও বাদামুল্লুকে ধান কাটতে যেয়ে এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তি পায় নি।

মতির বিয়ের তিন মাস পরেই মতির স্বামী ভাইদের থেকে পৃথক হয়। একক পরিবারে নিজের খেয়াল খুশী মত চলার উপায় থাকে, যা একান্নবর্তী পরিবারে সম্ভব নয়। মতির স্বামীর স্বভাব তেমন সংযত সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না; তাই নিজের খেয়াল খুশীমত চলার জন্য একক পরিবারের আশ্রয় নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

মতির বাবার মৃত্যুর পর মতির মাকে বেশ কিছু দিন কষ্ট করতে হয়েছিল জমি দেখাশুনা নিয়ে। পরবর্তীতে লালু, মতির মায়ের জমি দেখাশুনার দায়িত্ব নিলে মতির মা স্বস্তি অনুভব করে। লালু কোনক্রমেই মতির প্রতি দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই মতির মায়ের প্রস্তাবে মতিকে দেখতে মতির-শ্বশুরবাড়ি যেতে রাজী হয় লালু। ফটিকের বাড়ির পরিপাটি অবস্থা লালুকে বিস্মিত করে। লালু শুনেছিল ফটিক বড় গৃহস্থ কিন্তু এমন অবস্থাসম্পন্ন তা কল্পনাও করতে পারে নি। ফটিকের বাড়িতে লালুর যথেষ্ট আদর যত্নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু লালু তার সামান্যই গ্রহণ করতে পেরেছিল। লালুর মনে হয়েছিল ফটিকের প্রকান্ড ঘরটি মতিকে চেপে ধরে আছে। ফলে ফটিকের সুন্দর চেহারা, ভালো ব্যবহার, আদর-যত্ন সব কিছুই তার কাছে বীভৎস মনে হয়। তাই সে বাড়ির কাউকে না বলে অন্ধকারেই ফটিকদের বাড়ি ছেড়ে চলে আসে।

ফটিক মতিকে প্রকৃতই ভালোবাসত কিন্তু মতির শঙ্কিত নির্বাক দৃষ্টির অর্থ সে বুঝতে পারে নি। যখন বুঝতে পেরেছে তখন আর বেশী সময় নেই ফটিকের। এরপরও যতটুকু সময় সে পেয়েছে মতির কথাই ভেবেছে। তাই মতিকে, ফটিক কাছ ছাড়া হতে দেয় নি; মতিও তার স্বামীর মৃত্যুর শেষ কয়দিন নিজেকে স্বামীর সেবায় নিয়োজিত করেছে।

ফটিকের মৃত্যুর পর, দুখেকে মতির শ্বশুর-বাড়ীতে পাঠিয়ে মতির ফেরার অপেক্ষায় থাকে লালু। মতি ফিরে আসবে এই আনন্দেই লালু দিশেহারা কিন্তু মতি যে বিধবা, অসহায় তা লালুকে বিন্দু পরিমাণও স্পর্শ করে নি। মতি খুব সহজেই স্বামীর শোক কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল তার চিরপরিচিত পরিবেশের সান্নিধ্যে এসে। কিন্তু লালুর সঙ্গে মতির আগের সেই স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। তাদের দুজনের মধ্যে একটা দেয়াল তৈরী হয়; কিন্তু তারপরও সমস্ত শৈশবজীবনের স্মৃতিতে জড়িয়ে থাকা মতিকে একদন্ড ভুলে থাকা লালুর জন্য অসম্ভব।

মতি ফিরে আসার পর থেকে লালুর মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে। সে যেন পূর্বের লালু। নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য সে নিজের জমি

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি বর্গা জমি নিয়ে চাষাবাদ করতে শুরু করে। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে লালু প্রচন্ড জ্বরে শয্যাশায়ী হয়। লালুর এই অসুস্থতাই মতিকে কাছে টানে। মতির সেবা-যত্নে আরোগ্য লাভ করার পর লালু এক নতুনত্বের স্বাদ অনুভব করে।

লালু সুস্থ হয়ে উঠলে একাগ্রচিত্তে মতিকে পাবার প্রার্থনা করে। অন্যদিকে লালুর মা কোনক্রমেই বিধবা মতিকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নিতে পারছিল না। বিধবা মতির সাথে লালুর বিয়ে হলে সমাজে লালু হেয় প্রতিপন্ন হবে; এসব ভাবনা লালুর মাকে শক্তিহীন করে ফেলে। এভাবে দিন কাটতে থাকলে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে লালুর মা চির বিদায় নেয়। মৃত্যুকালে লালুকে বলে যায়, - মতিই যেন তার ঘরের লক্ষ্মী হয়। লালুর মায়ের মৃত্যুর পর তাদের দুজনের মধ্যে আবারও সঙ্কোচের দেয়াল গড়ে উঠে। এমন পরিস্থিতিতে মতি তার মামাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে মামার বাড়িতে গেলে লালু বিচলিত হয়। অন্যদিকে মতির মায়ের দুঃশ্চিন্তারও কোন অন্ত নেই। লালু যদি মতির চেয়ে আরোও ভালো মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে বিয়ে করে ফেলে; তাহলে মতিকে নিয়ে তার দুর্ভোগের শেষ থাকবে না। তাই মতির মা মতিকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হয়। পরবর্তীতে লালুই যায় মতিকে নিয়ে আসতে। মতিকে নিয়ে নৌকা করে ফিরে আসার সময় দুজনেই যেমন সঙ্কোচবোধ করেছে তেমন আকর্ষণও অনুভব করেছে।

অবশেষে মতি ও লালু তাদের সঙ্কোচের দেয়াল অতিক্রম করে এক বিন্দুতে পৌছাতে সক্ষম হয় এবং তাদের নৌকা স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। নদী দ্বারা তাদের দুজনের সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটে ; কারণ বর্ষার ফলে লালু ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বাদামুল্লুকে গেলে ফটিকের সঙ্গে মতির বিয়ে হয় ফলে লালুর সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়। আবার এই নদীবক্ষেই তাদের মিলন ঘটে।

৩

বাংলাদেশের মুসলমান কৃষক-পরিবারের জীবন সংগ্রামের কাহিনী এত জীবন্ত করে কোন ঔপন্যাসিক ইতোপূর্বে তুলে ধরেন নি। মুসলমান কৃষকের জীবন সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদের জ্ঞান যে কত গভীর ছিল, তা এ উপন্যাস পাঠেই বোঝা যায়। জমির শেখ, লালু, মতি, লালুর মা, মতির মা, ফটিক প্রভৃতি চরিত্র বাংলাদেশের কৃষক-সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

Dhaka University Institutional Repository

এই উপন্যাসে, ঔপন্যাসিক বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমজের সামগ্রিক জীবন-যাপনের একটি স্বচ্ছ চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেখানে যেমন আছে লালুর মত অস্বচ্ছল কৃষক আবার তেমনি আছে ফটিকের মত স্বচ্ছল ভোগ বিলাসসম্পন্ন কৃষকও। দুজনেই কৃষক-সমাজের সদস্য হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে বৈষম্যের কারণে তাদের জীবন-যাপনের ধরনেও যে পরিবর্তন – যা কাজী আবদুল ওদুদ এই উপন্যাসে সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লালুর বাবা জাফর শেখ মারা গেলে মতির বাবা জমির শেখ লালুদের জমি দেখাশুনার দায়িত্ব নেয়। ফলে জমির শেখের উপর লালুদের পরিবার নির্ভরশীল থাকে কিন্তু লালু বড় হলে সংসারের হাল ধরতে সক্ষম হয় এবং সংসারের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে; কিন্তু বর্ষার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই বিফলে যায়। পরবর্তীতে বাদামুল্লুকে যায় নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। এই সময় মতির বিয়ে হয়ে যায় অবস্থাসম্পন্ন কৃষক ফটিকের সঙ্গে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণেই লালু মতিকে হারায়। ইলিশমারি চরের এরফান মন্ডলের ছোট ছেলে ফটিকের অবস্থা সঙ্গতির কাছে লালুর ভালো মানুষের পাল্লা ভারী হতে পারে নি। ফটিকের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা মতির বাবা মাকে আকৃষ্ট করে যার ফলে কালবিলম্ব না করে ফটিকের সঙ্গে মতির বিয়ে দিয়ে দেয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার কারণেই ফটিক, মতিকে একবার দেখার পরই বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং তা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়। ফটিকের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তৎকালীন স্বচ্ছল বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমাজের ভোগ বিলাসিতার সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন । ফটিক নিজেকে কোন রকম সংযত করতে পারত না। চাষার-ছেলে হয়েও সে ভদ্রলোকের মত জামা, জুতা পরতে ও টেরি কাটতে একটুও দ্বিধাবোধ করত না। মতিকে বিয়ে করে আনার পর তার ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্তি যেন আরো বেড়ে যায়। মতির জন্য ভালো রঙিন ডুরে শাড়ি, মাথার নারিকেলের তেলে শুকনা সুগন্ধি ফুল এবং বাজার হতে সাবান এনে দিতেও ভুল করত না। এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে জমির চাষ-আবাদের ভার তার চাকরের হাতে থাকত । অন্যদিকে লালুর মত অস্বচ্ছল পরিবারের কৃষকদের চাষ-আবাদের কাজ নিজেদেরই করতে হতো এবং অধিক উন্নতির জন্য অন্যের জমি বর্গা নিতেও দেখা যায়। লালু, মতির মায়ের অনুরোধে মতিকে দেখার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য মতির শ্বশুর-বাড়িতে গেলে লালু বিস্মিত হয় ফটিকের ঘর-বাড়ি দেখে। ফটিকের বাড়ির জীবন-যাপনের ধরন লালুর মত অস্বচ্ছল কৃষকের কাছে কল্পনাতীত। এছাড়া ফটিকের বাড়িতে লালুর আদর-যত্ন, আপ্যায়ন, লালুকে নিয়ে চাকরদের ব্যস্ততা সব কিছুতেই বিলাসিতার ছাপ স্পষ্ট। অর্থাৎ কাজী আবদুল ওদুদ এই উপন্যাসে স্বচ্ছল বাঙালি মুসলমান কৃষক-পরিবারে প্রতিনিধি ফটিকের জীবন-যাপনের চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি খেটে-খাওয়া অস্বচ্ছল বাঙালি মুসলমান কৃষক-পরিবারের প্রতিনিধি লালুর জীবন-যাপনের চিত্রও তুলে ধরেছেন। এই অস্বচ্ছল কৃষক-সমাজের ছেলে-মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই সাংসারিক ছোট-খাটো কাজে নিয়োজিত থাকে। যাদের ভোগ-বিলাসিতার কোন সুযোগ থাকে না। চাষার-ছেলে লালুর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তৎকালীন কৃষক-সমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন ——

> অগ্রহায়ণ মাসের সকাল বেলা একটি এগারো-বারো বৎসর বয়সের চাষী ছেলে এই ডোবায় ছিপ ফেলিয়ে মাছ ধরিতেছিল। তাহার ছোট ছোট বড়শিতে টেঙরা পুঁটি প্রভৃতি ছোট মাছ খুব বেশীই ধরিতেছিল, এমন কি সে তাহার তিনটি ছিপ টানিয়া কূল পাইতেছিল না।[৯]

কৃষক-সমাজের মেয়ে মতিকেও নানা রকম কাজ করতে দেখা যায়। এগার বৎসর বয়সের মতি সাংসারিক কাজে বেশ চটপটে হয়ে উঠেছে। থালা-বাসন মাজা, উঠান পরিষ্কার করা, ডোবা ও কুয়া হতে ছোট কলসী ভরে পানি তোলা, গরুর চাড়িতে পানি দেওয়া সমস্ত কাজ সে খুব আনন্দের সঙ্গে করে। কিন্তু এই কৃষক-সমাজের ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মতিকে তার বাবার কাছে মুখে মুখে কিছু দোয়া- দরুদ শিখতে দেখা যায়; তা খুব শুদ্ধ না হলেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। আরবী উচ্চারণ জমির শেখের মুখে যে খুব শুদ্ধ হচ্ছিল এমন আশা করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু মতি খুব আদব-কায়দার সঙ্গে সেই শিক্ষাটুকু গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ এসব কালেমা অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে মুখে নিতে হয়, সেই শিক্ষাই পাচ্ছিল মতি। অর্থাৎ ভক্তি-শ্রদ্ধাই ছিল সে-সময়কার নিম্নবিত্ত মুসলমান কৃষক-সমাজের ধর্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য। গ্রাম্য ছেলে-মেয়েরা অল্পতেই চটে যায়, ঝগড়া-কলহ তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। ঔপন্যাসিক তাঁর নদীবক্ষে উপন্যাসে

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন কৃষক-সমাজের এমন একটি চিত্র তুলে ধরেছেন ঝড়ের দিনে লালু ও দুখের আম কুঁড়ানোকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার মধ্য দিয়ে। গোপাল গাঁয়ের হাফেজ চৌধুরী সঙ্গতি-সম্পন্ন লোক, আর লোকটির দান খয়রাতের হাতও মন্দ ছিল না। তাঁর নিয়ম ছিল যে, কাঁচা-কালে ঝড়ের সময়ে গাঁয়ের সব লোকই তাঁর বাগানে আম কুঁড়াতে পারবে। তিনি সঙ্গতি-সম্পন্ন লোক হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের অস্বচ্ছল মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। গ্রামীণ-জীবনে যে সকলে এক হয়ে বস-বাস করে, ঔপন্যাসিক এখানে তার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষক-সমাজের লোকেরা একে অপরের সাথে মিলে মিশে থাকে, বিপদে পড়লে সবকিছু ভুলে গিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করে; আবার স্বার্থের কারণে তাদের মধ্যে মনোমালিন্যেরও সৃষ্টি হয়। তাই মতি ও লালু ডোবার মধ্যে হাবু-ডুবু খেতে থাকলে ওপাড়ার কালু খাঁর সাহায্যে উদ্ধার হয়। অন্যদিকে যতদিন লালু ছোট ছিল ততদিন জমির শেখই তাদের দুই চার বিঘা জমি তত্ত্বাবধান করেছে; তাতে লালুদের সংসার না চললে নিজেদের অংশ থেকে ফসল দিয়ে সংসার চালিয়েছে। মতির বিয়ে নিয়ে লালুর মায়ের সঙ্গে মতির মায়ের মনোমালিন্য ঘটলেও বিধবা মতির দুদর্শার কথা চিন্তা করে লালুর মার বুক হাহাকার করেছে। এমনকি মতির বাবা মারা গেলে মতির মার কষ্ট হচ্ছিল দেখে লালুই মতিদের জমি দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছে। তাদের এ সব আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমাজের একাত্মতার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে।

কাজী আবদুল ওদুদ 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন একেবারে কাছ থেকে, সে জন্য সূক্ষ্ম কোন ঘটনাও তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। তাই কৃষক-পরিবারের ছোট ছেলে-মেয়ে লালু ও মতির মুড়ি ও পাটালি খাওয়ার বর্ণনা থেকে শুরু করে তাদের বেড়ে ওঠার আদি-অন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। লালুর বয়স যখন সতের বৎসর তখন তরুণ বয়সে বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ শব্দময় জীবনের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে লালু তার চারদিকের সবকিছুর উপরেই পুলক অনুভব করে। লেখকের ভাষায় ——

> কাজে তাহার অফুরন্ত উদ্যম, সাহসে উৎসাহে বুক কানায় কানায় ভরা ; তাহার খাওয়া-পরা, ঘর-বাড়ী সমস্তই দারিদ্রের নির্দশন ; কিন্তু তাহার চোখে তাহার এই খড়ের জীর্ণ কুটীর, পরণের মোটা খাটো ধুতি, পাতের মোটা

Dhaka University Institutional Repository

> আউশের চালের ভাত, হাতে লাগানো লাউকুমাড়ার তরকারি, আর কখনো নিজের মারা মাছের ঝোল যে কি অসীম তৃপ্তি ও আনন্দের পরিচায়ক তাহা বাহিরের কেহ তাহার এই ঘর বাড়ীর দিকে চাহিয়া ধারণাও করিতে পারিবে না।[১০]

লালু বড় হলে জমির শেখের সঙ্গে থেকে চাষ-আবাদ করেছে। দুই চাচা-ভাইপোর কাঁধেই থাকতো লাঙল জোয়াল। তবে পান্তার বাটি, আর পানির ভার বাঁকে করে লালুই কাঁধে নিত। তার চাচাকে নিতে দিত না। বেলা এক প্রহর গড়ে গেলে দুজনেই পান্তা খেয়ে নিত আর খুব ভালো করে এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে ধূমপানের সুখ উপভোগ করতো। গুরুজনের সামনে তামাক খাওয়া চাষার-ছেলের জন্য আদৌ দোষের কিছু ছিল না। অনেক সময় বাড়ি ফেরার পথে লালু, মতির জন্য দূরের বিল থেকে পদ্ম চাকা নিয়ে আসত। কাজী আবদুল ওদুদ বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমাজের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের চিত্র অত্যন্ত যত্ন করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। গ্রাম্য-মহিলাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার চিত্র তুলে ধরেছন লালুর মায়ের কথার মধ্য দিয়ে ——

> —ওরে মাচা ছুঁস্‌নে, কত কি মাড়িয়ে এলি। যা হাত পা ধুয়ে আয়, আমি ছাতু বের করে দিই। লালু মায়ের আদেশমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়া ছাতু খাইতে বসিল।[১১]

তার এই উক্তির মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার চেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে। দুখের মায়ের চরিত্রের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য-মহিলার কুটিলতা প্রকাশ পেয়েছে। দুখের মা পাড়ার কোন শ্বাশুড়ির সঙ্গে বৌ-এর কেমন সম্পর্ক, স্বামীর সঙ্গে কার বৌ কেমন বেহায়ার মত আচরণ করে ইত্যাদি লালুর মায়ের কাছে এসে না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পেত না। কৃষক-সমাজে 'মা' কে তুই বলার রেওয়াজ ধরা পরে লালুর মাকে লালুর তুই বলে সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে, বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমাজের সহজ-সরল মানুষের জীবন-যাপনের চিত্র অঙ্কন করেছেন সচেতনতার সঙ্গে। তৎকালীন সমাজে বাল্য-বিবাহের প্রচলন ছিল তারও প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। মতির বয়স তের বৎসর না হতেই তার মা বিয়ের জন্য দুঃশ্চিন্তা শুরু করে। মতির বাবা-মার ইচ্ছা মতির বড় গৃহস্থের ঘরে বিয়ে হবে। যদি না হয়, তখন লালুর সঙ্গে মতির বিয়ে দিবে। এখানে বাস্তব জীবনবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। লালু ছেলে হিসেবে ভালো হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব স্বচ্ছল নয়; তাই ইলিশমারি চরের এরফান মন্ডলের ছোট ছেলে ফটিকের সঙ্গে মতির বিয়ের প্রস্তাব এলে মতির মা খুশীতে আত্মহারা হয়। মতির মনের কোন খবর তার অভিভাবকেরা জানতে চেষ্টা করে নি। অভিভাবকদের এই চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তের মধ্যে মধ্যযুগীয় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মতির মা খুশিতে আত্মহারা হলেও মতির বাবা খুশি হতে পারে নি। তার মনে ভয় ছিল, সে বার বার মনে করে, লালুর বাপের কথা অমান্য করে সে অন্যায় করছে। মতির বাবা বিবেকের দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করলেও আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পন্ন ঘরে মেয়েকে বিয়ে দিবে এই লোভও ছাড়তে পারে নি। নারী স্বাধীন চিন্তা করতে পারে নি তৎকালীন সমাজে যা মতির মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাই লালুকে ভালোবেসেও ফটিকের ঘরে যেতে হয়েছে মতিকে। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীরা সব সময়ই অসহায়। ঔপন্যাসিক তারই চিত্র তুলে ধরেছেন মতির অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে। পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে মতি তার পিতাকে দেখতে আসতে পারে নি যেমন তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুর-বাড়িতে টিকে থাকতে পারে নি, শ্বশুর-বাড়ির লোকদের দুর্ব্যবহারের জন্য। এই উপন্যাসে বাল্য-বিবাহের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি বহু-বিবাহের প্রতি আগ্রহও প্রকাশ পেয়েছে লালুর মায়ের চিন্তার মধ্য দিয়ে। লালুর মা বিধবা মতিকে পুত্রবধু হিসেবে মেনে নিতে পারে নি। তাই সে মনে মনে ভেবেছে, লালুকে প্রথমে অন্য জায়গায় বিয়ে করাবে তারপর মতির সঙ্গে বিয়ে দিবে।

লালু কৃষক-পরিবারের ছেলে হলেও তার মধ্যে যথেষ্ট রুচিশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লালু আর দশজন চাষা ছেলের মত নয়। বিধবা মতিকে আপন করে পাবার জন্য সে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছে কিন্তু তাতে কোন উগ্রতা নেই, নেই কোন উশৃঙ্খলতা। তার এই

Dhaka University Institutional Repository

মানসিকতায় নিম্নশ্রেণীর মানসিকতা থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তার চিন্তা-চেতানায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতাই ধরা পড়ে। তেমনি জমির শেখ কৃষক-সমাজের প্রতিনিধি হয়েও কুসংস্কারমুক্ত ও ধর্মভীরু। লালু বাদামুল্লুকে যাবার সময় মতি পিছন থেকে লালুকে ডাকলে লালুর মা অমঙ্গলের আশঙ্কা করলে জমির শেখ তা প্রতিবাদ করে। জমির শেখের এই প্রতিবাদের মধ্যে কুসংস্কারমুক্ত মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ঔপন্যাসিক 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে মতির বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমাজের বিয়ের অনুষ্ঠানের চিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। মতির মা মতির বিয়ের আয়োজনে কোন কিছুর ঘাটতি হতে দেয় নি। মাছ দিয়ে লোক খাওয়ানো জমির শেখের ইচ্ছা থাকলেও মতির মার রাগারাগির জন্য জমির শেখ পরে দুটি খাসির জোগাড় করেছে ——

> মাছ দিয়া লোক খাওয়ানোই জমিরের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহার স্ত্রী রাগিয়া তাহার গলার প্রায় এক পোয়া ওজনের হাঁশ্‌লি বাহির করিয়া তাহার সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল —নেও, টাকায় যদি ছাই পড়ে গিয়ে থাকে তবে হাঁশ্‌লিগাছা বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে এস। পেটে ধরেছি তো মেয়ে। [১২]

মতির বিয়ের কাজ-কর্মে সহায়তার জন্য এসেছে জমিরের বন্ধুরা। বাড়ির ভিতরে উঠানে তিন-চারটি চুলা খনন করা হয়েছে। সেখানে কালু খাঁ ও ওসিমদ্দি লম্বা লম্বা কাঠের চ্যালা ধরিয়ে ভাত, ডাল, গোশত ইত্যাদি রান্না করছে; কিন্তু ভিতরের রান্নাঘর পাড়ার মেয়ে দিয়ে একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কেউ পেঁয়াজ-রসুন ছিলছে, কেউ বেগুন-কচু-লাউ-কুমড়া কাটছে, কেউ হাঁড়ি ধোয়ার কাজ করছে। এর ফাঁকে সুযোগ মত কেউ এটা ওটা চুরি করে মেয়ের কোঁচে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। মতির মা যদিও খুব সাবধানী মহিলা কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে তার পক্ষে এত খোঁজ রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

পিঠা-চিড়া বাঙালি ঐতিহ্যের অংশ বিশেষ। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে গেলে পিঠা নিয়ে যাবার প্রচলন তৎকালীন সমাজেও প্রচলিত ছিল – যা মতির শ্বশুর-বাড়ি যাবার সময়ে লালুকে দিয়েছিল মতির মা। বৌ-শ্বাশুড়ির দ্বন্দ্ব সব সমাজেই কম-বেশী দেখতে পাওয়া যায়। কৃষক-সমাজেও তার পরিচয় পাওয়া যায় দুখের-বৌ এর সঙ্গে দুখের-মায়ের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে এই সময় থেকে, তাই দুখে বৌ নিয়ে বাড়ি ছেড়েছে। ব্যক্তি স্বার্থের জন্য যৌথ পরিবারে ধস নামতে শুরু হয়েছে এবং একক পরিবারের প্রতি আগ্রহ বাড়তে শুরু করেছে। ব্যক্তিস্বার্থের কারণে দুখের মধ্য দিয়ে যেমন অস্বচ্ছল কৃষক-সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের চিত্র ফুটে উঠেছে তেমনি অবস্থাসম্পন্ন ফটিকের ভোগবিলাসিতার মধ্য দিয়ে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের চিত্র ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থেকেই একক পরিবারের যাত্রা শুরু হয় তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ। ঔপন্যাসিক তৎকালীন সমাজে জমিদারদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন লালুর বাবা ও মতির বাবার তৈরি বাড়ি-ঘর ছেড়ে গোপাল গাঁয়ে চলে আসের মধ্য দিয়ে। জমিদারদের অত্যাচারে তারা ভিটে জমি ছেড়ে গোপাল গাঁয়ে এসে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে এখানেই স্থায়ীভাবে বস-বাস করতে থাকে। সে-সময়কার সমাজে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার চিত্র ফুটে উঠেছে অসুস্থ লালুর মায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। সমাজে তখনও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হয় নি। অসুস্থ লালুর মায়ের চিকিৎসা করে গদাই কবিরাজ। তাঁর ঔষধে লালুর মায়ের কোন কাজ না হলে তিনি বলেন ——

> – বাপু, সত্যি কথা বলতে কি তোমার এই বুড়ো মাকে নিয়ে আর টানাটানি করো না; এখন তোমাদের মোল্লাকে ডেকে ধর্মের কথাটতা একে শোনাও আর যা খেতে চায় তা এনে দাও। মানুষ কি আর চিরকাল বাঁচে! [১৩]

গদাই কবিরাজের কথার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়া এই উপন্যাসে মুসলিম-পরিবারের নিয়ম-নীতির প্রকাশ সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়।বিশেষ করে লালুর

Dhaka University Institutional Repository

মার মৃত্যুর পরে, লালুর কালেমা পাঠ করার মধ্য দিয়ে। চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা শুধু অস্বচ্ছল কৃষক-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এই চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা অবস্থাপন্ন জোতদার তনয় ফটিকের চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যেও ফুটে উঠেছে; তাই কয়েক দিনের জ্বর-কাশিতে মারা যায় ফটিক। তৎকালীন গ্রাম-বাংলায় অপর্যাপ্ত ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে। ঔপন্যাসিক তৎকালীন গ্রাম-বাংলার মহিলাদের যাতায়াত ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন; মতি ও মতির মায়ের পর্দাঘেরা ডুলিতে করে গোপাল গাঁয়ে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে। তৎকালীন কৃষক-সমাজে এই পর্দা প্রথার পরিচয় পাওয়া গেলেও এই পর্দা প্রথার রীতি ততটা ভয়ঙ্কর ছিল না।

৪

'নদীবক্ষে' উপন্যাসে, কৃষক-সমাজের ছেলে লালুর ছোটবেলার মাছধরার বর্ণনা থেকে শুরু করে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আম কুঁড়ানো নিয়ে ঝগড়া, মতির সঙ্গে খেলা-ধুলা এবং পরবর্তীতে তাদের বাহ্যিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের পরিবর্তন, লালুর চাষ-আবাদ, ছোটবেলা থেকেই লালু ও মতির সাংসারিক কাজ, প্রাতিষ্ঠানিক কোন লেখা-পড়ার চিহ্ন মাত্র পাওয়া না গেলেও মতির বাবার কাছে মতির দোয়া-দরুদ শেখা, মতির বিয়ের অনুষ্ঠানের আদি-অন্ত বর্ণনা ইত্যাদিতে কাজী আবদুল ওদুদ তৎকালীন বাঙালি মুসলমান গ্রামীণ-সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন।

কৃষক-সমাজের মানুষেরা সবাই এক হয়ে বস-বাস করে তাই একজনের দুঃখে অন্যজনও দুঃখ পায়; তার প্রমাণ মেলে বিধবা মতি বাড়ি ফিরে এলে তার প্রতি গ্রামের মানুষদের সহমর্মিতাবোধের মধ্য দিয়ে। বিধবা মতি ফিরে এলে লালুর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয় অর্থাৎ বিধবা-বিবাহের প্রতি লালুর কোন আপত্তি ছিল না। লালু বিধবা-বিবাহকে খুব সহজভাবে মেনে নিলেও তার মা প্রথমে মেনে নিতে পারে নি কিন্তু মৃত্যুক্ষণে মতিকেই তার ঘরের লক্ষ্মী হওয়ার কথা বলে যায়। অর্থাৎ বিধবা-বিবাহের প্রতি কোন রকম

Dhaka University Institutional Repository

কড়াকড়ি ছিল না তৎকালীন বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমাজে। বৃদ্ধ কালে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালন সর্বকালেই বাঙালি সমাজে দেখা যায়, তার ব্যতিক্রম হয় নি অসুস্থ লালুর মার প্রতি লালুর দায়িত্ব পালনের মধ্যে। লালুর মার মৃত্যুর পর মতি তার মামাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে মামার বাড়ীতে গেলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য লালু যায়। তাদের ফেরার বর্ণনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। এই উপন্যাসের ত্রিশটি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ তৎকালীন বাঙালি মুসলমান গ্রামীণ-সমাজের অবস্থা তুলে ধরেছেন।

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমাজের একেবারে ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবার জীবন-যাপনের ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সাথে সে-সময়কার সমাজে জমিদারদের অত্যাচার, একান্নবর্তী পরিবার ভাঙন, বাল্য-বিবাহের প্রচলন, বহু-বিবাহের প্রতি আগ্রহ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি চিত্র তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, কাজী আবদুল ওদুদ অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে তৎকালীন বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমাজের সুখ-দুঃখ ভরা দৈনন্দিন জীবন-যাপনের চিত্র 'নদীবক্ষে' উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আজাদ

কাজী আবদুল ওদুদের অপর উপন্যাস 'আজাদ'। 'আজাদ' উপন্যাসটি ১৯৪৮ সালে (১৩৫৫ বঙ্গাব্দে) প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মঈনউদ্‌দীন হোসয়ন বি-এ, নূর লাইব্রেরী, ১২/১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা।[১৪]

'আজাদ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে 'খেলাধূলা' নামে আবদুল কাদির সম্পাদিত জয়তীতে প্রকাশিত হয়। জয়তী পত্রিকার দশটি সংখ্যায় (১ম বর্ষ-২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩৩৭ থেকে ২য় বর্ষ-৭ম-৯ম সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৩৮) এবং মুহম্মদ হবীবুল্লাহ ও বেগম শামসুন নাহার সম্পাদিত বুলবুল পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ-১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৪ থেকে ৪র্থ বর্ষ পৌষ ১৩৪৪) এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আবদুল কাদির বলেন —

> রোমাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিসতফ্' চারি খন্ডে সমাপ্ত ; তারই আদলে 'আজাদ' রচনার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। মনে হয়, ১৩২৯-৩১ সালে তার প্রথম খন্ড ঃ 'খেলাধূলা'র (জাঁ ক্রিস্তফের প্রথম খন্ডঃ Dawn) খসড়া তৈরী হয়েছিল। এই উপন্যাসের নায়িকা 'রাবিয়া' তাঁর বহু-চেনা কিশোরী জমিলার—'সুন্দর চঞ্চল মহিয়সী কলিকার' কল্পছবি।[১৫]

'খেলাধূলা' নামে পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে 'আজাদ' নামে বের হলে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ-পরিবর্তন প্রধানত ভাষাগত।[১৬] আরো কয়েকটি খন্ডে এই উপন্যাসখানি সমাপ্ত করার পরিকল্পনা কাজী ওদুদের ছিল।[১৭] ভূমিকায় তিনি বলেছেন —

> 'আজাদ' নাম দিয়ে যে – রচনাটি প্রকাশিত হলো, তা একটি বড় পরিকল্পনার আদি স্তর। এই পরিকল্পনার মূলে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল মাহাত্ম গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, আর বিশেষ করে রোমাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্টোফার' বইখানি। এই পরিকল্পনাটি রূপ দেওয়ার কাজে আমার কয়েক বৎসর ব্যয়িত হয়েছিল। তারপর 'নবপর্যায়'-আদি রচনায় মন দিতে হলো – এই পরিকল্পনাটি আজো পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।.....[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

ওদুদের এ-উপন্যাস রচনাকালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীর সত্যাগ্রহ নীতি হিংসাত্মক পদ্ধতির কাছে সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করলেও কাজী আবদুল ওদুদ উপলব্ধি করেছিলেন এ-নীতির অপরাজেয় শক্তি। কারণ এই সত্যাগ্রহ নীতির গোড়ায় আছে ন্যায়বোধ ও মানবপ্রেম– যা মানব জাতিকে যুগ যুগ ধরে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। ওদুদ ন্যায়বোধ ও মানবপ্রেমকে ভিত্তি করে এমন একটি চরিত্র তাঁর এ–উপন্যাসে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যিনি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে মহীয়ান। সম্ভবত আজাদই ছিল তাঁর সেই পরিকল্পিত চরিত্র।[১৯]

২

'আজাদ' উপন্যাসের কাহিনী সামন্ত-সমাজ নির্ভর কিন্তু এর বিকাশ উদার মানবতাবাদী বুর্জোয়া মূল্যবোধে। অর্থাৎ উদীয়মান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের কাহিনী এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আজাদ। সে চৌধুরী মোহাম্মদ আজম সাহেবের পুত্র। আজম সাহেবেরা দৌলতপুর নামক একটি গ্রামে বাস করেন। এটি বাংলাদেশের একটি প্রাচীন গ্রাম। হাট-বাজার, পোস্ট-অফিস, বড় স্কুল এ-সবের অভাব সত্ত্বেও এই গ্রামের যথেষ্ট নাম আছে। এখানে চৌধুরী-পরিবারের অনেক দিনের বাস। পুরুষ-পরম্পরা সঙ্গতি-সম্পন্ন গৃহস্থ তারা। নিজে পেট ভরে খাওয়া আর অপরকে পেট ভরে খাওয়ানো তারা খুব ভালোভাবেই বোঝেন। এটা তাদের বংশের বহুকালের প্রথা। এই অঞ্চলে চৌধুরীদের প্রতিপত্তি অসাধারণ। চৌধুরীরা ছাড়াও এই গ্রামে আরো কয়েকটি আশরাফ-গোষ্ঠীর পরিচয় মেলে তারা হলো কাজী-গোষ্ঠী, খাঁ-গোষ্ঠী। কাজী-গোষ্ঠীর নাম আরবী-ফারসী লেখা-পড়ায়, আর খাঁ-রা বড়লোক বাঁধাই কারবারে বহু টাকা জমিয়ে। কিন্তু আলেমই হোক আর টাকা পয়সার লোকই হোক কারো সাধ্য নেই যে দৌলতপুরের চৌধুরীদের মতো অপরকে প্রাণ ভরে খাওয়াতে পারে আর বিপদে পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। চৌধুরী আজম সাহেব বর্তমানে এই চৌধুরী পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলমান সমাজে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে এ উপন্যাসে বলা হয়েছে যে, স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এই আখ্যায়িকার শুরু। বাংলার অন্যান্য মুসলমান-পল্লীর মতই এই আন্দোলন দৌলতপুরের মুসলমান-পল্লীর শান্তির ব্যাঘাত ঘটায় নি। স্বদেশী আন্দোলন আজম সাহেবকে একটুখানি ভাবিয়েছিল সত্য কিন্তু তা খুব বিচলিত করে নি। তিনি হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার সমস্ত জটিলতাকে খুব সহজ করে ভাবতেন এবং এর জন্য হিন্দুদেরকেই দায়ী করতেন। আশে-পাশের সব শ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর বেশ জানা-শোনা ছিল ; সম্প্রীতির কোন অভাব ছিল না। এই হিন্দুদের মধ্যে দুই একটি ভালো লোক জন্মালেও তাদের সংকীর্ণমনা বলে ভাবতেন আজম সাহেব। আর তাদের দ্বারাই দেশের সর্বসাধারণের উন্নতি, স্বাধীনতা, এসব বিশ্বাস করতে রাজী ছিলেন না আজম সাহেব।হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সে-সময় এ-উপমহাদেশের প্রধান সমস্যা। সে-সমস্যা নিয়ে অনেকেই যেমন ভেবেছিলেন তেমনি ভেবেছিলেন দৌলতপুরের আজম সাহেব।

আজম সাহেব খুব বেশি লেখা-পড়া করেন নি। বিদেশে বড় স্কুলে পড়বেন এই ছিল তাঁর মনের ইচ্ছা। কিন্তু তিনি তাঁর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ার কারণে তা সম্ভব হয় নি। তাঁর পিতা তাঁকে কাছেই রেখে দিলেন এবং বললেন দূর দেশে গিয়ে অত কষ্ট করে লেখা-পড়া করার কাজ নেই ; আমার যা আছে তাতেই তোমার চলে যাবে। ফলে আজম সাহেব লেখা-পড়ায় বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তৎকালীন মুসলমান সমাজের অভিভাবকরা লেখা-পড়ার প্রকৃত গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি, যার স্বীকার হয়েছেন আজম সাহেব। অর্থাৎ শিক্ষা সম্পর্কে তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে আজম সাহেবের অভিভাবকদের মানসিকতার মধ্য দিয়ে। আজম সাহেব শুধু সঙ্গতি-সম্পন্ন গোষ্ঠীপতিই নন, বিবেচনাবোধ, সামাজিকতা, আশ্রিতবাৎসল্য, আভিজাত্য-বোধ এসব তার চলাফেরাতেও একটা বিশিষ্টতা দান করেছে ; যাতে করে তিনি সবার কাছেই সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। তিনি আরবী চর্চা করেন নি কিন্তু ফারসী পড়ে আস্বাদ পেয়েছেন। সাদীর গুলিস্তাঁ তাঁর প্রিয়।

Dhaka University Institutional Repository

আজম সাহেব বাংলার পল্লীতে মানুষ, সে জন্য পল্লীর সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ স্বভাবতই গভীর হয়েছে। পল্লী-গ্রামে থাকলেও বাংলা খবরের কাগজ আর মাসিকপত্রের নিয়মিত গ্রাহক তিনি। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান-পিপাসু মন বহির্জগৎ এর সাথে সম্পর্কিত। ফলে তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সে-সময় চারদিকে আঞ্জুমান গড়ার হিরিক পড়ে, যা আজম সাহেবকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই তিনি গ্রামে শালিস, বিচার, রোজা, নামাজ, মুসলমানী আদব-কায়দার জন্য আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ পোষণ করেন। তিনি যেমন সমাজ-সচেতন ছিলেন তেমনি স্বাস্থ্য-সচেতনও ছিলেন। তাই গ্রাম-বাসীদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন এবং এদের নিরক্ষরতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আজম সাহেব তৎকালীন সামন্ত-সমাজের প্রান্তিক প্রতিভূ হলেও চিন্তায় বেশ উদার, সমাজ-প্রগতি ও কল্যাণের অনুসারী ছিলেন। গ্রামের মানুষদের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা তার মধ্যে কাজ করেছে। তাই তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে যেমন ভেবেছেন তেমনি তাদেরকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করতেও চেয়েছেন। লেখকের ভাষায় ——

> কিন্তু কা'দের এ সব কথা বোঝানো! জীবনের কতটুকু অর্থ তাদের কাছে! জন্মা, বড় হওয়া, পরিশ্রম করা, উপার্জ্জন করা, স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে বসবাস করা,আর সময় বা অসময়ে মরে যাওয়া,এ সমস্তের মূলে অন্ধ একঘেয়ে অভ্যাস আর আহার-নিদ্রা প্রভৃতি জন্তু-সুলভ প্রয়োজনের তাড়না ভিন্ন আরো যে কিছু থাকতে পারে– এ যে তাদের স্বপ্নেরও অতীত।[২০]

তাই তিনি নাইট স্কুলের ব্যবস্থা করেন, এই সব মুর্খ গ্রাম-বাসীদের সামান্য জ্ঞানদানের কথা ভেবে। এ-সময় যারাই শিক্ষার আলোতে আলোকিত হয়েছেন তারাই সমাজের জন্য কিছু করায় তাগিদ অনুভব করেছেন। লেখকের ভাষায় ——

Dhaka University Institutional Repository

> এদের নিরক্ষরতাই যে এদের সব দুর্দ্দশার মূল কারণ, শেষে সেই চিন্তা তাঁর মনে প্রবল হয়ে দাঁড়ালো। কাগজেও তিনি পড়েছিলেন, চাষীরা যদি অল্প লেখাপড়াও শিখতে পারে তাতেই তাদের উন্নতির সূত্রপাত হ'তে পারে, তা হলে পরিবর্ত্তন তাদের অত অপ্রিয় হবে না। নাইট স্কুলের কথা তাঁর জানা ছিল, ঠিক করলেন, একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।[২১]

মনসুর সাহেব আজম সাহেবের চাচাতো ভাই। মনসুর সাহেব এন্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ করে আজম সাহেবের বাড়ীর সেই নাইট স্কুলে গ্রাম-বাসীদেরকে নিয়মিত শিক্ষা দান করতে থাকেন। কারণ এদেরকে শিক্ষিত করতে পারলে গ্রামের সংস্কার করা সহজ হবে বলে আজম সাহেবের বিশ্বাস; কিন্তু গ্রাম-বাসীদের অজ্ঞতার কারণে আজম সাহেবের পক্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় নি। তাঁর উক্তি —

> ..... এরা কিছু বুঝলে না, কিছু বুঝলে না – স্বাস্থ্য যে কি অমূল্য বস্তু এ-কথা তিনি কিছুতেই এদের মনে পৌঁছে দিতে পারলেন না।[২২]

এসব কারণে আজম সাহেব পরবর্তীতে সংসার ধর্মে অধিক মনোযোগী হয়েছেন। গ্রামের উন্নয়নের জন্য তাঁর প্রবল ইচ্ছা এবং চেষ্টা দুই ছিল কিন্তু অজ্ঞ গ্রামবাসীদের নিয়ে আশানুরূপ কিছু করতে পারেন নি। তাই তিনি এসব পরিকল্পনা থেকে দূরে সরে আসেন।

আজম সাহেবের দুটি সন্তান, আজাদ ও হাসিনা। আজাদের আগে আরো দুটি সন্তান মারা গেছে আজম সাহেবের। তিনি তাঁর প্রথম যৌবনে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ কয়েকজন পুরুষ যেমন দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর, শেখ সাদী, সম্রাট বাবর, রাজা রামমোহন রায়, এসব গুণীব্যাক্তিদের জীবনী তাঁর মনের গভীরে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে রয়েছিল। তিনি সেই সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ছায়া তাঁর ছেলে আজাদের মধ্যে দেখতে চান। কিন্তু হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে এসব গুণীজন থেকে অনেক উপরে স্থান দিয়েছেন। কারণ তিনি হজরত

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ (সাঃ) কে কোন মানুষের সাথে তুলনা করেন নি। তিনি আশ্চর্য ধরনের মানুষ, সে-রকম মানুষ কোন দিন জন্মায় নি। আজম সাহেবের এই বিশ্বাসের মধ্যে আস্তিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

আজম সাহেব খুব শিক্ষিত লোক নন তিনি ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান-পিপাসু মন ছেলে আজাদকে আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবার স্বপ্ন দেখে। তখনকার দিনে শিক্ষিত বাঙালিদের ডিপুটি হওয়ার একটা স্বপ্ন ছিল; কিন্তু আজম সাহেব ছেলেকে ডিপুটি হওয়ার চেয়ে বড় মনের মানুষ হতে উৎসাহিত করেছেন। ছেলের প্রতি আজম সাহেবের উক্তি —

> — ডিপুটির চাইতে অনেক কিছুই ত বড় আছে ও হচ্ছে এক চাকরী — চাকরীর জন্য কি কাউকে বড় বলা যায় ! যাঁরা অনেক টাকা পয়সার লোক, রাজা মহারাজা, তাঁদের বড় বলা যায় না। আসল বড় হচ্ছেন তিনি যাঁর মন বড় — নিজের স্বার্থ নয় পরের ভালোর দিকে যাঁর খেয়াল। হাজি মোহাম্মদ মোহসীন, বিদ্যাসাগর, এঁদের কথা পড়েছ ; এঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত বড়।[২৩]

এসব কথা কিশোর আজাদকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয় এবং গুণীব্যাক্তিদের জীবনী তাকে মুগ্ধ করে। তাঁদের বীরত্বপূর্ণ ও কৃতিত্বপূর্ণ জীবনী আজম সাহেবের কাছ থেকে শুনে আজাদের মনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক করে। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে আজম সাহেব বলেন —

> –তাঁর সাহস তেজ এ সবের কথা ভাবলে তাঁকে লম্বা চওড়া জোয়ান বলেই মনে হয়। কিন্তু তিনি দেখ্‌তে তেমন জোয়ান ছিলেন না, বরং খাটো ছিলেন। এই থেকে আরো ভালো বুঝতে পারবে, বাইরে খুব শান-শওকত থাকলেই লোক বড় হয় না, যাঁর মন বড়, মনে জোর আছে, আসল বড় তিনি।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

আজম সাহেব তার ছেলেকে বিদ্যাসাগরের মতাদর্শে আদর্শায়িত হতে উৎসাহিত করেন। তাই আজাদের মাইনর পরীক্ষার পর কার কাছে রেখে পড়ালে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অনেক বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন, আজাদকে আহমদ সাহেবের কাছে রেখে পড়াবেন। আহমদ সাহেব আজম সাহেবের ভগ্নীপতি; কিন্তু দুঃখের বিষয় বিয়ের পাঁচ বৎসর পরে সেই বোন মারা যায়। এরপর তিনি পুনরায় বিয়ে করেন। তাঁর পরবর্তী স্ত্রী রহিমার গুণে আজম সাহেব মুগ্ধ। লেখকের ভাষায় —

> শেষে তাঁর চিন্তার ভারকেন্দ্র ঝুঁকে পড়ল আহমদ সাহেবের দিকে। তাঁর মার্জ্জিত বুদ্ধি, বিদ্যা, আর সকলের উপরে, তাঁর সুন্দর অথচ অনাড়ম্বর জীবন। আজম সাহেব আরো ভাবছিলেন তাঁর স্ত্রী রহিমার কথা। সুবিচার, ঠান্ডা মেজাজ, অপরের জন্য সহানুভূতি, এ-সব গুণের জন্য তিনি সবারই শ্রদ্ধার পাত্রী। তার উপর তিনি সুশিক্ষিতা। আরবী ফারসী কিছু জানেন, উর্দ্দু বাংলা ত খুব ভালোই জানেন।[২৫]

রহিমার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজে নারী-শিক্ষার কিছুটা আভাস পাওয়া গেলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা নয়। অর্থাৎ নারী-শিক্ষা শুধু গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই ভগ্নীপতির প্রতি আজম সাহেবের ছিল দৃঢ় বিশ্বাস ও অধিক আস্থা তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে আজাদকে তাঁর কাছে রেখে পড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আজাদ পাবনায় আহমদ সাহেবের বাড়িতে বেশ ভালভাবেই নিজেকে মানিয়ে নেয় কিন্তু খেলা-ধুলার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ দমে যায় নি। দৌলতপুরে থাকা অবস্থাতে যেমন পাবনায় এসেও ঠিক তেমনি নেশা। খেলা-ধুলার প্রতি তার এই আকর্ষণ আহমদ সাহেবের স্ত্রী রহিমার মনে সংশয়ের জন্ম দেয় এবং পরে রহিমার কৌশলে আজাদ লেখা-পড়ায় অধিক মনোযোগী হয়। পরবর্তীতে আজাদ খেলা-ধুলা ও সঙ্গীসাথীর মোহ কাটিয়ে লেখা-পড়ায় বেশি মন দেয় আর বিকেলের দিকে পদ্মার পাড়ে একা একা ঘুরে বেড়ায়। এই পদ্মা নদীর সাথে যেন তার যোগসূত্র আছে। কারণ দৌলতপুরেও তাকে পদ্মার কাছ ঘেষে ঘুরে, ফিরে, চড়ে বেড়াতে দেখা যেত। এখানে আজাদের মধ্যে তারুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

রহিমার সঙ্গে আজাদের বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, তাই সব বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আজাদ খোলা-মেলা আলোচনা করতে পারে। নারী-শিক্ষার অপ্রতুলতার কারণে রহিমাও স্কুলে পড়েন নি। কিন্তু তাঁর বড় ভাই জবরদস্ত প্রফেসার। তাঁর কাছ থেকে রহিমা অনেক কিছু শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁর ভাই সম্পর্কে রহিমা বলেন —

> আমরা ছোট, বুঝবো না, এ–সব তিনি কখনো ভাবতেন না; বলতেন, খুব ভালো পুষ্টিকর খাদ্য যেমন ছেলেবেলা থেকেই খেতে হয়, তেম্‌নি কি ভালো কি মন্দ, কখন কি রকম ব্যবহার করবে,কখন কিভাবে কথা বল্‌তে হবে, এ-সব বিষয়েও কিছু কিছু শিক্ষা ছেলে বেলা থেকেই হওয়া চাই।[২৬]

রহিমার বড় ভাই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আহমদ সাহেব বলেন, একটি জীবন্ত গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে, পাতার চেহারা বিভিন্ন ঋতুতে বদলায়, গাছ বৃদ্ধি পায় তেমনি মানুষের ভিতরে কোন গুণকে তখনই জীবন্ত বলা যায় যখন সেই গুণটা তার মধ্যে স্থায়ীভাবে জেগে থাকে। একটা লোক এক সময়ে বেশ ভালো আবার অন্য সময়ে ভয়ানক মন্দ, তেমন নয়। একজন ব্যক্তি এমন হতে পেরেছেন যখন তিনি শুধু কথায় ভালো নয় – কথা, কাজ, বিশ্বাস, ব্যবহার সমস্তের ভিতর দিয়ে তাঁর ভালোত্ব বুঝতে পারা যায়। রাবিয়ার মামা তেমন একজন লোক ছিলেন বলে আহমদ সাহেব দাবী করেন। সমাজে গুণী মানুষের গুণাগুণ নিয়ে এ-সময়কার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেশ আলোড়ন ওঠে।

এই উপন্যাসে আজাদকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার যথাযথ পদক্ষেপ নিতে দেখা গেছে। যার যতটুকু জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, অভিজ্ঞতা আছে সব কিছু নির্দ্বিধায় আজাদকে দান করতে দেখা যায়।

এদিকে আজাদদের স্কুলে অপরেশ বাবু নামে একজন নতুন ইংরেজি শিক্ষক এসেছেন – যার পড়ার ঢং আজাদকে অনুপ্রাণিত করে আর তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

অসাধারণ জ্ঞান তাকে মুগ্ধ করে। সেই ইংরেজি শিক্ষকের পড়ানোর ঢং অনুকরণ করে আজাদ ঘরে অনুশীলন করলে আহমদ সাহেবের কন্যা রাবিয়ার কাছে অদ্ভুত লাগে। এই রাবিয়ার সাথে আজাদের বেশ সখ্যতা। আজাদ ইংরেজি শিক্ষকের কাছে যা শুনে, তা ফুফুকে বাসায় এসে শোনায়। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে আজাদের মধ্য দিয়ে। শেক্সপীয়রের জীবনী আজাদকে অনুপ্রাণিত করে। আজাদ তার শিক্ষকের কথা বলে এভাবে —

> Shakespeare -এর জীবন বড় মজার। তিনি নাকি পৃথিবীর সব চাইতে বড় কবি, কিন্তু নিজে যখন বই লিখেছেন তখন আদৌ ভাবেন নি যে তিনি এত বড় কবি। আমাদের মাষ্টার মশায় বল্লেন – প্রকৃতই যিনি বড় তাঁর এই লক্ষণ।[২৭]

আজাদ তার শিক্ষকের কথা জানাতে পেরে বেশ আনন্দ পাচ্ছিল; শেষে ফুফুর শোনার উৎসাহ দেখে আজাদ আরো বলে —

> —Shakespeare—এর সময় নাকি ইংল্যান্ডের লোকেরা সখ করে মাথায় খুব বড় চুল রাখতেন। Shakespeare—এরও তাই ছিল। তিনি কি ভালো কি মন্দ সাধু চোর মাতাল সকলের সঙ্গেই মিশ্‌তেন, আর সব লোকের চরিত্রই এমন নিখুঁৎভাবে এঁকেছেন যে আর কেউ তেমন আঁকতে পারেন নি।[২৮]

রহিমাও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যারা প্রকৃত বড়, বাইরে তাদের ভড়ং নেই – যা তাঁর ভাইকে দেখে জেনেছেন। আহমদ সাহেবের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আজাদের ভালোই কাটছিল পাবনার দিনগুলো। সেই সাথে রাবিয়ার সঙ্গে আজাদের সম্পর্কও অন্যদিকে মোড় নিতে দেখা যায়। আজাদের অবচেতন মনে রাবিয়ার অনুপ্রবেশ তখনই উপলব্ধি করতে পরেছে, যে বার বাড়ীতে ছুটি কাটিয়ে পাবনায় এসে রাবিয়ার দিকে তাকাতে পারছিল না। তার বুকের রক্ত নাচছিল। প্রায় মাস দেড়েক পরে রাবিয়াকে দেখে আজাদের ভেতর এরকম অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আজাদের আচার-আচরণ, লেখা-পড়ায় একনিবিষ্টতা আহমদ সাহেবকে মুগ্ধ করে। তাই তিনি একদিন গল্পেরছলে রহিমাকে বলেন, আজাদ-রাবিয়া ওরা দুজন বড় হলে ওদের বিয়ে দিব। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্মানের ভয়ে পিছ পা হয়েছেন। কারণ আজাদের বাবা নিজ থেকে প্রস্তাব না দিলে তা সম্ভব হবে না। এই অনিশ্চয়তা তাদের দুজনের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক করে। ধীরে ধীরে রাবিয়ার প্রতি আজাদের দুর্বলতা বেড়েই চলে; তাই উপন্যাসের শেষে রাবিয়ার প্রতি কিশোর আজাদের হৃদয়ে যে প্রেমের সঞ্চার হয়, লেখক তা প্রকাশ করেছেন এভাবে —

> —তারপর তার সমস্ত আবেগ আপনা থেকে গলে' পড়লো রাবিয়ার পায়ে, অনর্গল ভাবে ঢেলে' পড়ে' যেন রাবিয়াকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। তার সমস্ত বুক হাল্কা হয়ে গেল। তার চিরদিনের এই চেনা রাবিয়া। আজো সুন্দর– চঞ্চল। কিন্তু তার সামনে আজাদ নিজে যেন বদ্‌লে গেছে। তার সব সর্দ্দারি অদৃঢ় মোমের মতো গলে' গেছে। ফ্যাল-ফ্যাল কাঙাল দৃষ্টিতে সে চেয়ে' রইল এই মহীয়সী কলিকার পানে।[২৯]

যদিও ঔপন্যাসিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আরো কয়েক খন্ড উপন্যাস লিখবেন কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি। সে হিসেবে এই উপন্যাসটির পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না। এরপরও উপন্যাসটিতে জীবনবোধের পূর্ণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের নায়ক আজাদের খেলা-ধুলা ও লেখা-পড়ার মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যার ভেতর দিয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কৈশোরিক স্তরের কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই একুশটি পরিচ্ছেদে।

৩

'আজাদ' আইডিয়া প্রধান উপন্যাস। ঔপন্যাসিক এই আইডিয়া প্রকাশ করেছেন সংলাপের মাধ্যমে; আর সেই সংলাপের মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজের রুচির পরিচয় ফুটে উঠেছে। সে-সময়কার সমাজে আরবী -

Dhaka University Institutional Repository

ফারসী ভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তবে তা ব্যাপকভাবে নয় এবং তা একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। মনসুর সাহেব ডিপুটি ম্যাজেষ্ট্রেট তিনি বুর্জোয়া মূল্যবোধের বিশ্বাসী ব্যক্তি। তিনি অন্যত্র কখনও আরবী-ফারসী ভাষা ব্যবহার করেন নি কিন্তু বাবুর্চির সাথে কথা বলার সময় এই ভাষা ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ একটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। মনসুর সাহেব ও বাবুর্চি কথোপকথন ——

> মনসুর সাহেব খুশী হয়ে বল্লেন- "কোশেশ কর্না জিস্সে বিরিয়ানী উদমা উত্তরে।" বাবুর্চি সেলাম জানিয়ে বল্লে-"হুজুর কি নেক নজর আওর মেরী নসীব।"[৩০]

মনসুর সাহেব উদার ও সৌখিন প্রকৃতির লোক। তিনি এক পূজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন তাঁর ওয়ালেদ-ওয়ালেদা মরহুমের কবর জেয়ারত করতে। মনসুর সাহেব জিয়ারত উপলক্ষে লোক খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রগতিশীল মানসিকতার মানুষ তাই সব পুরনো রীতি-নীতি মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। চেঁচামেচি হুড় হাঙ্গামা করে কতগুলো লোক খাওয়ানোকে তিনি পছন্দ করেন না। এটা তাদের বংশের রেওয়াজ কারণ চৌধুরীদের মত প্রাণ ভরে খাওয়ানোর রেকর্ড নেই এই দৌলতপুর অঞ্চলে। উপন্যাসে আশরাফ-আতরাফের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠলেও আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানদের নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে। তবে এই আশরাফদের মধ্যে চৌধুরীরাই সেরা একথা বলা যায় নির্দ্বিধায়। চৌধুরীদের বংশ-মর্যাদার গৌরব এবং তাদের আভিজাত্যবোধের প্রকাশ সর্বত্র এই উপন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। মনসুর সাহেবের পোশাকের মধ্যে দিয়ে তা ফুটে উঠেছে। লেখকের ভাষায় ——

> মিহি কোর্ত্তা গায়ে, পরণে আলিগড়ী পা'জামা, পায়ে দামী নাগরা জুতো- .....। তাঁর ঈষৎ গৌরকান্তি, নাতি-দীর্ঘ বপু, তীক্ষ্ণদৃষ্টি চক্ষু।[৩১]

ঔপন্যাসিক আজহারউদ্দিনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ——

Dhaka University Institutional Repository

> তাঁর কালো রং, মুখে চাপ-দাড়ি, পাক্কা মুসল্লি মোত্তাকী লোক, আর তাঁর উচুঁ মোটা নাক চৌধুরীদের বিশেষত্বের পরিচায়ক।[৩২]

অর্থাৎ শারীরিক গঠনেও তাদের আভিজাত্যের ছাপ পড়েছে যা ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় ধরা পড়ে।

এই উপন্যাসে খেলা-ধুলার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে মিলে-মিশে যা শিখা যায় তাই প্রকৃত শেখা। তাই মনসুর সাহেব খেলা-ধুলার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আজহার সাহেবকে বলেন —

> — হামিদের যে মাথা নেই তা নয় ; তবে ওর পড়ায় মন নেই। সেই জন্য পড়াশুনার জন্য খুব বেশি তাম্বি না ক'রে আপততঃ ওর মন-মতো বেশী খেলতে দেওয়াই ভালো। খেলিয়ে বেড়িয়ে যে অল্প সময়টুকু পড়বে তাতেই এখনকার চাইতে ভালো পড়াশুনা হবে।[৩৩]

খেলা-ধুলার ক্ষেত্রে সঙ্গী নির্বাচনও অত্যন্ত জরুরী যা এই উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ শ্রেণী বৈষম্যের চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। সে জন্য আজাদ ও তাঁর সঙ্গীরা চাষার-ছেলেদের সঙ্গে খেলে নি অথচ তাদের খেলার ধরন আজাদের খুব পছন্দ হয়েছিল; কিন্তু অভিভাবকদের নিষেধ তাদের মনের গভীরে শক্ত আসন পেয়েছিল। লেখকের ভাষায় —

> চাষার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে নেই। তাদের গুরুজনদের সেই 'না' অনেকখানি জোর দিয়ে বলা। তা'রা আর কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, যে বিরূপতা নিয়ে উচ্চরণ করা এই 'না' তার রংটি তাদের চোখে ফিকা নয়। কিন্তু বাঁধ দিয়ে জলের গতিরোধ করা যায়- তার ফুলে' ওঠা রোধ করা যায় না।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত বংশের সন্তান চৌধুরী আজম সাহেব ছেলেকে বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। তিনি সব সময় আজাদের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রেখেছেন, যাতে কোন রকম অন্যায় তাকে স্পর্শ না করে। আজম সাহেবের উক্তি —

> —যাঁরা তোমার মুরুব্বি, সম্মানের পাত্র, তাঁদের কোনো কথা কি ব্যবহার বুঝতে না পারলে কখনো সামনা-সামনি উত্তর করতে যাবে না। এ আদবের খেলাপ। আর যার ভদ্রবংশে জন্ম, নিজে ভদ্রলোক হতে চায়, তার পক্ষে আদবের খেলাপ —জঘন্য।[৩৫]

আজম সাহেবের এ ধরনের শক্ত কথা আজাদকে আঘাত করে। অর্থাৎ বংশ-মর্যাদার গৌরবের চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে।

আতিথেয়তা বাঙালি সংস্কৃতির অংশ। এই উপন্যাসে সে-সময়কার বাঙালি মুসলমান সমাজের আতিথেয়তার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে আহমদ সাহেবের বাসায় আহমদ সাহেবের বন্ধু ও সহকর্মী মৌলবী ফজ্‌লে আলিকে দাওয়াত করে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে। ফজলে আলি সাহেব বলেন —

> — 'যেখানেই যাই আহম্‌দ সাহেবের বিবির রান্না আর এঁদের মেহ্‌মানদারির খুবী কোনোদিন ভুল্‌বো না।[৩৬]

আতিথেয়তার আরেকটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে রহিমার মিঞাভাই প্রফেসর সাহেবের মধ্য দিয়ে। রহিমার উক্তি —

> কত গভীর জ্ঞানী, অথচ এতটুকু অহঙ্কার নেই। টাকা-পয়সা বংশমর্য্যাদা মান-সম্ভ্রম, এসবে তাঁর অভাব নেই ; অথচ সামান্য একটি লোক তাঁর বাড়ীতে অতিথি হলে নিজে খোঁজ নিয়েছেন তার খাওয়া দাওয়া ভাল হলো কিনা, বিছানাপত্র কোথায় দেওয়া হলো, এসব।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আহমদ সাহেবের বাসায় আজাদের আতিথেয়তা সত্যই বাঙালি মুসলমান সমাজের অবিচ্ছেদ্য রূপ।

চৌধুরীদের বংশ-মর্যাদা, বিপদে সাহায্য দান করার মন-মানসিকতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি অত্যাচারের খবরও জানা যায়। অর্থাৎ সে-সময়কার বাঙালি সমাজে জমিদারদের অত্যাচারের ও আভ্যন্তরীণ দোষ ত্রুটির কিছু চিত্র উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় —

> অথচ এঁদের মাটি থেকে দু'চার ঘর প্রজাও উচ্ছেদ হয়েছে, আর শরাফতের গর্ব্ব এঁদের মজ্জাগত। এরা 'ভাল মানুষ' আর আশেপাশের লোকেরা 'ভালো মানুষ' নয় এদের পরিবারের ছেলেরাও কেমন ক'রে সে সমন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে। কিন্তু এ কলঙ্ক নিয়েও এঁদের দেলোয়ারীর যশ–চাঁদ চিরদিন অম্লানভাবে বিরাজ করে আসছে।[৩৮]

চৌধুরী মোহাম্মদ আজম সাহেব সে-সময়কার উদীয়মান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের সচেতন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি সামন্ত-সমাজের প্রান্তিক প্রতিভূ হয়েও নিজের ছেলেকে উদার মানবতাবাদী আদর্শে গড়ে তোলতে উদ্যোগী হয়েছেন। জ্ঞান-চর্চাই তাকে এই মহৎ পরিণতিতে উত্তরণে সহায়তা করেছে; কিন্তু এত উদার মানসিকতার মানুষ হয়েও ছেলের ব্যাপারে যতটা যত্নশীল তাঁর মেয়ে হাসিনার লেখা-পড়ার ব্যাপারে ততটা যত্নশীল নন। কারণ আজাদের উন্নত শিক্ষার জন্য পাবনার আহমদ সাহেবের বাড়িতে রাখতে বিন্দু পরিমাণ সঙ্কোচবোধ করেন নি; অথচ একই পিতার কন্যা সন্তান হাসিনা লেখা-পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাকে ঘরে বানান করে করে কোরআন শরীফ পড়তে শোনা যায়। আআন্নাকুম বাআন্নাকুম বছর তিনেক আগেও সে এই ভাবেই পড়ে কোরআন শরীফ খতম করেছে। তার এই পড়া নিছক অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়; আর এসব ঘটেছে হাসিনার পিতা-মাতার উদাসীনতার কারণেই। কারণ তারা পুত্র সন্তানের লেখা-পড়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু কন্যা সন্তান হাসিনার প্রতি যেন উদাসীন। আজম সাহেবের সব মনোযোগ যেন আজাদকে ঘিরেই। আজম সাহেব গ্রাম-বাসীদের শিক্ষিত করার জন্য নাইট স্কুলের ব্যবস্থা করেন অথচ

Dhaka University Institutional Repository

নিজের মেয়ের লেখা-পড়ার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেন নি। দৌলতপুর অঞ্চলে মেয়েদের স্কুল যদি না থেকে থাকে, ওকে ঘরে লেখা-পড়া শেখানোর চেষ্টা করতে পারতেন কিন্তু তার কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি এই উপন্যাসে। তেমনি আহমদ সাহেবের মেয়ে রাবিয়ার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। বাবা-মা সুশিক্ষিত হওয়ার পরেও তাকে ঘরে লেখা-পড়া করান নি; যদিও সেখানে মেয়েদের কোন স্কুল ছিল না; তারা ইচ্ছে করলে ঘরে মেয়েকে নিয়মিত লেখা-পড়া করার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি। বরং তাকে গৃহস্থালী কাজে অর্থাৎ রান্না-বান্না শেখানোর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আহমদ সাহেবের স্ত্রীর প্রতি আহমদ সাহেবের উক্তি ——

40416

"রাবিয়াকে কিন্তু তুমি রান্নাবাড়া কিছুই শেখাচ্ছ না।" [৩৯]

অর্থাৎ সে-সময়কার বাঙালি মুসলমান সমাজে নারী-শিক্ষা গুরুত্ব পায় নি অর্থাৎ নারী-শিক্ষা ছিল অবহেলিত।

তৎকালীন সমাজে বিয়ে শাদীর ব্যাপারে কৌলীন্য-প্রথার প্রচলন যে ছিল তার ইঙ্গিত মেলে রহিমার উক্তিতে ——

> —তা আজাদের বাপ রাবিয়াতে অপসন্দের আর কি পাবেন? বাপের কুল নানার কুল কোনো দিকই তার খারাপ নয় — আর সে খোদার দোয়ায় একেবারে গরীবের মেয়েও নয়।[৪০]

পরিশেষে বলা যায় যে, এই উপন্যাসে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। বিশেষ করে কিশোর আজাদকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায়। এই শিক্ষার প্রভাবেই বাঙালি মুসলমান সমাজে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। উদীয়মান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই উন্মেষ, তাই নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। নুরুল আমিন, কাজী আবদুল ওদুদ-রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড), ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪৯৯।

২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা (৮-৯)।

৩। খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- (৩১৬-৩১৭)

৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৭

৫। নরুল আমিন, কাজী আব্দুল ওদুদ-রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড), ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৪৯৯।

৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- (৪৯৯-৫০০)।

৭। খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৩১৭।

৮। নুরুল আমিন, কাজী আব্দুল ওদুদ- রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড), ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৯৩।

৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৩।

১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৮।

১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৬।

১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৫।

১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০০।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫০২।

১৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০২।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০২।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০।

১৮। আবদুল কাদির, কাজী আবদুল ওদুদ, ১৯৭৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩।

১৯। খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ; সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩১৯।

২০। নুরুল আমিন, কাজী আবদুল ওদুদ-রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড), ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩২০।

২১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২০।

২২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২২।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৬।
২৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৯।
২৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮০।
২৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬৮।
২৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬৯।
২৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮৬।
৩০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫১।
৩১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫০।
৩২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫১।
৩৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫২।
৩৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৩৪।
৩৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৩।
৩৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৭৪।
৩৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮০।
৩৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৭।
৩৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭৪।
৪০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্য-জীবনের শুরু কথাসাহিত্য দিয়ে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ একটি গল্প-সংকলন, নাম 'মীর-পরিবার' (১৯১৮)। এই গ্রন্থটি তাঁর ছাত্র-জীবনের রচনা। এতে পাঁচটি গল্প আছে। বাঙালি মুসলমান সমাজই এই গল্পগুলোর প্রধান উপজীব্য। 'মীর-পরিবার' গল্প-গ্রন্থের প্রথম গল্প 'মীর-পরিবার' বাঙালি মুসলিম সমাজের ভূমি-নির্ভর ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র। গ্রাম-বাংলায় এই একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যাধিক্য থাকলেও যুগ পাল্টাবার সাথে সাথে তা ক্ষয়ে যেতে থাকে। ফলে একক পরিবারের জন্ম হয়েছে, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। ভূমি-নির্ভরতার পরিবর্তে চাকুরী-নির্ভরতা বেড়েছে। সমাজের এই বিবর্তনের ধারাকেই কাজী আবদুল ওদুদ এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন।

'মীর-পরিবার' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'আশরাফ হোসেন'। আধা-সামন্ত শরাফতির মোহমুগ্ধতার ভেতর থেকে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের চাকুরী-নির্ভর যে নব্য নাগরিক জীবন বিশ শতকের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই গল্পে। এই গল্পে কাজী আবদুল ওদুদ বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় রীতি-নীতির বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত যত্ন করে। এই গ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'করিম পাগলা'। গল্পটিতে সামন্ত-পরিবেশ বিস্তার করে থাকলেও অসহায়, দুস্থ মানুষ করিমকে নিয়ে গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক সে-কালের গ্রাম-বাংলার বিত্তহীন মানুষের সাধ-আহলাদের চিত্র অঙ্কন করেছেন করিম পাগলার মধ্য দিয়ে। এই গ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'হামিদ'। গল্পটিতে হতাশা ও ব্যথাদীর্ণ এক মাতৃহারা তরুণের অর্ন্তযন্ত্রণার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সে-সময়কার বাঙালি মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফের পার্থক্য যে পুরো ঘুচে যায় নি তার প্রমাণ মেলে। এই গ্রন্থের সর্বশেষ গল্প 'আবদুর রহিম'। গল্পে কাজী আবদুল ওদুদ বিশ শতকের গোড়ার দিকের উচ্চ-শিক্ষিত উঠতি বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এরা আধা-সামন্ত যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ; যাদের সামন্তবাদ বিরোধী কোন ভূমিকা ছিল না। উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণের ফলে তাদের ভেতরে বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হলেও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে তারা খুব দূরে সরে আসতে পারে নি। সেই সাথে নারী-শিক্ষার অনগ্রসরতার ছাপ স্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

'মীর-পরিবার' গল্পগ্রন্থের পরে 'নদীবক্ষে' (১৯১৯) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এই দুটো গ্রন্থে কাজী আবদুল ওদুদ যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

'নদীবক্ষে' উপন্যাসটিতে তৎকালীন বাঙালি মুসলমান কৃষক-সমাজের আচার-আচরণ, তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন, সাংসারিক কাজ-কর্ম, গ্রাম্য-মহিলাদের কুটিলতা, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ, জমিদারদের অত্যাচারের সংবাদ, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের চিত্র, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অপ্রতুলতা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। কাজী আবদুল ওদুদ অত্যন্ত চমৎকারভাবে বাঙালি মুসলমান গ্রামীণ সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

কাজী আবদুল ওদুদের অপর উপন্যাস 'আজাদ' (১৯৪৮)। এই উপন্যাসে উদীয়মান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাহিনীই বিধৃত হয়েছে। এখানে আশরাফ-আতরাফের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বাঙালি মুসলমানেরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য নানা দিকে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে এমন আভাস পাওয়া যায়। আজম সাহেব তার ছেলেকে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতেই আগ্রহ দেখান নি বরং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের জীবনী পড়তে উৎসাহিত করেছেন। তিনি, তার ছেলে আজাদকে ডিপুটি হওয়ার চেয়ে বড় মনের মানুষ হতে আগ্রহ দেখান। সেই সাথে এই উপন্যাসে শ্রেণী বৈষম্যের চিত্রও ফুটে উঠেছে। তাই চাষার-ছেলের সঙ্গে আজাদের সাথীরা খেলতে যায় নি। খেলার সঙ্গী নির্বাচনেও তারা সাবধানী হয়েছে। চৌধুরী আজম সাহেব সে-সময়কার উদীয়মান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের সচেতন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি সামন্ত-সমাজের প্রান্তিক প্রতিভূ হয়েও নিজের ছেলেকে উদার মানবতাবাদী হতে আগ্রহ দেখিয়েছেন; কিন্তু ছেলে আজাদের বেলায় যতটা সচেতন মেয়ে হাসিনার বেলায় ততটা সচেতন নন। তাই উপন্যাসে তাঁর কন্যা হাসিনার প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষার খবর পাওয়া যায় না এবং ঘরেও তার লেখা-পড়ার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, যা শুধু আরবী পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া এই উপন্যাসের আহমদ সাহেবের মেয়ে রাবিয়ার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। রাবিয়ার বাবা-মা সুশিক্ষিত হবার পরেও রাবিয়াকে ঘরে লেখা-পড়া করান নি। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে নারী-শিক্ষা ছিল অবহেলিত।

Dhaka University Institutional Repository

'আজাদ' উপন্যাসের কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ পায় গল্প ও নাটিকা সংকলন 'তরুণ' (১৩৫৫)। এই গ্রন্থে তিনটি গল্প আছে। 'তরুণ', 'মা' এবং 'ভুল'। এই তিনটি গল্পের একটির অবলম্বন তারুণ্য এবং অপর দুটো প্রধানত বাৎসল্যরসের গল্প।

'তরুণ' গল্পগ্রন্থের 'তরুণ' গল্পটিতে তারুণ্য প্রধান বিষয় হলেও এখানে হিন্দু-মুসলমানের মিত্রতার অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। কাজী আবদুল ওদুদ এই গল্পে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির চিত্র অঙ্কন করেছেন গল্পের নায়ক নরেনের সঙ্গে অন্যান্য মুসলমান ছেলেদের বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে। গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'মা'। এই গল্পের 'মা' বৃদ্ধা ভিখারিণী হিন্দু; অর্থাৎ কাজী আবদুল ওদুদের গল্পে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি মাতৃস্নেহের অপূর্ব চিত্র অঙ্কন করেছেন বৃদ্ধা ভিখারিণীর মধ্য দিয়ে। গল্পের নায়ক নবীন লেখক বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তাধারার ধারক। এই বাঙালি মুসলমান তরুণ শ্রেণী বৈষম্যকে অতিক্রম করে বৃদ্ধা ভিখারিণীর মাতৃস্নেহের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। গল্পকার বৃদ্ধা ভিখারিণীর মধ্য দিয়ে গ্রাম-বাংলার নিম্নবিত্ত সমাজের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'ভুল'। গল্পটিতে সে-সময়কার বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের চিত্র ফুটে উঠেছে। সে-সময়কার সমাজের মানুষ যথেষ্ট সচেতন হয়েছে এবং শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক অগ্রসর হয়েছে। তাই শদু অসুস্থ হলে তারা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়। অর্থাৎ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে বাঙালি মুসলমান সমাজেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। ফলে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থারও প্রসার ঘটেছে — যা এই গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

জ্ঞান ও প্রেম এই দুইকে মিলিয়ে ওদুদ-মানসকে বোঝা সম্ভব। হীনমন্যতাকে তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তিনি উগ্রপন্থী ছিলেন না, ছিলেন যুক্তিবাদী। তিনি অন্ধ ধর্মানুরক্তি, কুসংস্কার, কুপ্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ধর্মের প্রতি গভীর নিষ্ঠা তাঁকে করেছিল উদার-সহনশীল। ধর্মকে তিনি অনুষ্ঠানের মধ্যে পেতে চেষ্টা করেন নি, তাকে পেতে চেয়েছেন জীবনের গভীর উপলব্ধিতে। মুসলিম সমাজকে তিনি ভালোবাসতেন, তাই তার সংশোধনের চেষ্টায় তিনি লেখনী ধরেছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ বেশীর ভাগই লিখেছেন কালোপযোগী সমস্যা নিয়ে। সংস্কারকের উৎসাহই তাকে সাহিত্যের পথে উদ্বুদ্ধ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

জন্মভূমি পূর্ববাংলার প্রতি কাজী আবদুল ওদুদের মায়া আর ভালোবাসার পরিচয় তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলো থেকে পাওয়া যায়। গল্প-উপন্যাসে পূর্ববাংলার একান্ত গ্রাম-জীবনের চিত্র নিবিড় যত্নে তিনি অঙ্কন করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানদের বিরূপ পরিবেশের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি একটা আগ্রহ গড়ে উঠতে শুরু করেছে এবং সেই সাথে উন্নত জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে – যা কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

(ক) মূলগ্রন্থ

কাজী আবদুল ওদুদ-রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড)
নরুল আমিন সংকলিত ও
সম্পাদিত, ১৯৯২, বাংলা একাডেমী,
ঢাকা।

(খ) সহায়ক গ্রন্থ

আবদুল কাদির — কাজী আবদুল ওদুদ
১৯৭৬, বাংলা একাডেমী,
ঢাকা।

খোন্দকার সিরাজুল হক — মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঃ
সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম,
১৯৮৪, বাংলা একাডেমী,
ঢাকা।

মোতাহর হোসেন সুফী — বেগম রোকেয়া ঃ জীবন ও সাহিত্য,
২০০১, ১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয়
স্টেডিয়াম, ঢাকা।

মুহাম্মদ আবদুল হাই
সৈয়দ আলী আহসান — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
(আধুনিক যুগ), ১৯৭৯, আহমদ
পাবলিশি হাউস, ঢাকা।

সাঈদ-উর রহমান — ওদুদ-চর্চা, ১৯৮২,
একাডেমিক পাবলিশার্স
ঢাকা।